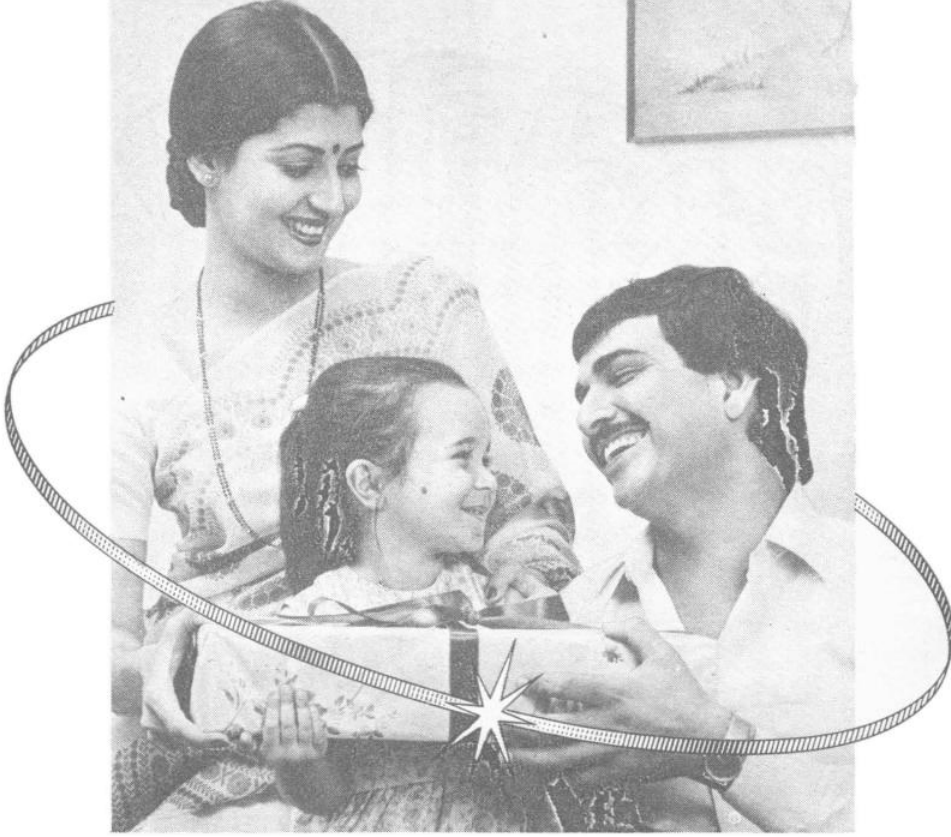


গোলগায়েল



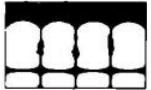
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!



আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র!

নিয়মিত কোলগেট ব্যবহার সারা পরিবারকে দেয় সুস্থসবল দাঁত
আর তাজা নিশ্বাস। এর থেকেই তো আসে আত্মবিশ্বাস!
আর কোলগেটের তাজা স্মিটি স্বাদ কার না পছন্দ!

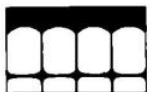
প্রতিবার দাঁত মাজার সময়ে কোলগেটের বিশিষ্ট
ফর্মুলা কীভাবে কাজ করে দেখুন।



দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা
খাবারের টুকরো থেকেই নিশ্বাসের গন্ধ
আর দাঁত ক্ষয়ের শুরু।



কোলগেটের অক্সিজেন সক্রিয় ফেনা
দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয়ক্ষতিকারী
খাবারের কণাগুলো বার করে আনে,
রোগজীবাণু হ'তে দেয় না।



ফলে দাঁত থাকে সুস্থসবল,
নিশ্বাস হয় স্বচ্ছেরে তাজা।

প্রতিদিন নিয়মিত কোলগেট দিয়ে দাঁত
মাজতে ভুলবেন না। সম্ভব হ'লে প্রতিবার খাবার পর।
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!
আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র।



GK&E B94.55 Ben

কি তাজা স্মিটি স্বাদ!

সম্পূর্ণ উপন্যাস

বানভাসি । লীলা মজুমদার ৩৩

গল্প

হারানো-প্রাপ্তি । অশোক বসু ৯

ভূতের পাঙ্কি । অধীর বিশ্বাস ১৩

দুঃখী হাতি পোলেপোলে । মঞ্জুরী লাহিড়ী ১৭

নিরালম্বাবা ও আনন্দবাবু । প্রবীর ঘোষ ২৫

গোলের রহস্য । অমিতাভ দত্ত ৫৫

ছড়া ও কবিতা

বড়দিন । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৭

মেঘের বাড়ি । হিমাংশু জ্ঞান ১৯

বেকুব টিকটিকি । সুজিত সরকার ১৯

ধারাবাহিক উপন্যাস

কালো পদারি ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৩

শার্লক হোমসের গল্প

কমলালেবুর পাঁচটি বীজ । অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন ২৯

ইতিহাসের গল্প

কলকাতার পুরনো হোটেল । প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৮

বাইরে, দূরে

আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি । সোমা দত্ত ৫২

লেখাপড়া

অর্থ জ্ঞানো । দেব-সেনাপতি ৫

সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৫

জেনে নাও । অরুণরতন ভট্টাচার্য ৭

সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল । অপরাজিতা ৫১

খেলাধুলো

ভারত জয়ে ফিরল । রাজা গুপ্ত ৬২

তোপের মুখে অষ্টেলিয়া । অশোক রায় ৬৩

কলকাতায় আসছেন ফুটবল-সম্প্রদায় । রূপক সাহা ৬৪

ইডেনে আটবার । নৃপতি চৌধুরী ৬৫

টেস্ট-ক্রিকেটে পিতাপুত্র । অসীমকুমার সরকার ৬৬

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স

টিনটিন ২০, টারজান ৩২, রোভার্সের রয় ৪৬

সদাশিব ৪৮, ফ্যাশ গার্ডন ৬০, গাবলু ৬১

অন্যান্য আকর্ষণ

তোমাদের পাতা ৪৯ ; ধাঁধা, শব্দসন্ধান ৫৮

মজার খেলা, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। বিমান মাণ্ডল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

- * আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ?
- * আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
- * আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত
প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া



স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য
সতেজ রাখার
উৎকৃষ্ট
টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক। যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ— অর্থাৎ ব্রাক্সী, শতমূলী, বেড়েলা, অম্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক। ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১
ফোন নং—৪১-০০৬৯

প্রকৃতিই আপনার ত্বকের শত্রু!

ত্বকের সুরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক
উপাদান ও প্রকৃতিদত্ত উপায়ই
সবচেয়ে ভাল...



বোরোক্যালেনডুলা-ই একমাত্র
অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম যাতে আছে
প্রাকৃতিক উপাদান-ক্যালেনডুলা ও
হাইড্রাসটিস ভেজের নির্যাস। যা
সব সময় আপনার ত্বকে সুরক্ষিত রাখে।

বোরোক্যালেনডুলা অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম
মাখুন, আপনার ত্বক স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখুন।*

বোরো ক্যালেনডুলা

অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম '৫'

* A PATENT & PROPRIETARY HOMOEOPATHIC MEDICINE, OF HAHNEMANN LABORATORY, CALCUTTA - 12

anjan chakraborty, Cal-74

জবরদস্ত, জামবাটি...



যুগে-যুগে বিদেশীরা কেউ বাণিজ্য করতে, কেউ লুণ্ঠন করতে, কেউ দেশ জয় করতে ভারতে পদার্পণ করেছিল। তারা এখন প্রায় বিলীন, কিন্তু তাদের বহু বিদেশী শব্দ বাংলাভাষায় প্রবেশ করে আজও রয়ে গেছে। মোগল যুগে বহু আরবি ফারসি শব্দ বাংলাভাষায় আসে, তারপর এল পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজি শব্দ। নীচের শব্দগুলি ঐ জাতীয় বিদেশী শব্দ। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে।

১। জবরদস্ত—(ক) পালোয়ান, (খ) অত্যাচারী, (গ) বাহুবলে বলবান, (ঘ) যে দুর্বলের প্রতি জুলুম করে।

২। জামবাটি—(ক) সুদৃশ্য বাটি, (খ) কাঁসার বড় বাটি, (গ) জামাইকে খেতে দেবার জন্য বিশেষ মাপের বাটি, (ঘ) খাগড়া অঞ্চলে তৈরি এক ধরনের বাটি।

৩। রেস্ত—(ক) সামান্য টাকা-পয়সা, (খ) হাত-খরচের অল্প টাকা, (গ) পাথেয়, (ঘ) খরচের পর যে অর্থ সম্বল থাকে।

৪। এজমালি সম্পত্তি—(ক) একার সম্পত্তি, (খ) যৌথ সম্পত্তি, (গ) দেবোত্তর সম্পত্তি, (ঘ) নিষ্কর সম্পত্তি।

১। জবরদস্ত (ক) পালোয়ান (খ) অত্যাচারী (গ) বাহুবলে বলবান (ঘ) যে দুর্বলের প্রতি জুলুম করে।
২। জামবাটি (ক) সুদৃশ্য বাটি (খ) কাঁসার বড় বাটি (গ) জামাইকে খেতে দেবার জন্য বিশেষ মাপের বাটি (ঘ) খাগড়া অঞ্চলে তৈরি এক ধরনের বাটি।

৩। রেস্ত (ক) সামান্য টাকা-পয়সা (খ) হাত-খরচের অল্প টাকা (গ) পাথেয় (ঘ) খরচের পর যে অর্থ সম্বল থাকে।
৪। এজমালি সম্পত্তি (ক) একার সম্পত্তি (খ) যৌথ সম্পত্তি (গ) দেবোত্তর সম্পত্তি (ঘ) নিষ্কর সম্পত্তি।

৫

দেব-সেনাপতি

নতুন বন্ধু

কিছুদিন থেকে চামেলির সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু বিমলা। পুজোর ছুটির পর থেকে বিমলা ইস্কুলের বাসে যাওয়া-আসা করতে আরম্ভ করেছে। আগে সে গাড়িতে আসত।

Her father used to drive her to school.

After school her mother used to come and bring her home.

Bimala could see that some days this arrangement could present problems.

There were days when her father had to go to work earlier than usual.

On such occasions Bimala herself would suggest she might just take a public bus and go to school.

"All by yourself?" his father would say. "I should think not. Not until you're a little older."

So her mother had to find the time in the midst of her house work and take her to school.

Bimala saw that it was very inconvenient for her. Still she had to do it.

Bimala told some of her friends at school about this.

"What are the school buses for?" one of them asked. "Our school has a whole fleet of them. I'm sure one of those could pick you up."

Most of Bimala's friends themselves came to school in school buses. They didn't see why Bimala shouldn't, too.

"But can I get a seat in a school bus now, in the middle of the year? Should I ask my father to enquire?"

"You can go and ask Mrs. Raut yourself," suggested Chandrabali.

So Bimala went and asked Mrs. Raut, who was in charge of the school buses, if she could use the facility.

"I don't see why not," she answered. "In fact I was myself going to suggest it. I'm surprised you girls put your parents to so much trouble when you could easily use our buses."

তারপর থেকে বিমলা বন্ধুদের সঙ্গে মজা করে ইস্কুলের বাসেই যাওয়া-আসা করছে।

"And it's such fun," she once told Chameli. "I never thought the journey itself could be so much fun."

লক্ষ করো, নিজে কিছু করার কথা জোর দিয়ে বলতে গেলে, এই রকম ভাবে বলতে হয় :

Bimala herself would suggest she might take a bus.

Bimala's friends themselves came in school buses.

You can go and ask Mrs. Raut yourself.

I was myself going to suggest it.

আবার, একলা কোথাও যাওয়া কিংবা কিছু করার কথা বলতে,

All by yourself?

খুলে বলতে গেলে

Do you want to go all by yourself?

প্রসাদ

এমন উপহার ওদের দিন যা
ওদের সাথেই স্বপ্ন দেখে বড় হয়



চিলড্রেনস গিফট প্ল্যান ইউনিটস

আপনার ছেলেমেয়েদের
ইউনিট কিনে দিন। ৫০ টাকা
থেকে শুরু করে ১০ এর
গুণিতকে যে কোন সংখ্যার
আপনার খুশীমতন। তাদের
ইউনিটের সাথে সাথেই তারা
বড় হয়ে উঠবে, তাদের স্বপ্ন
সত্যি হবে।

ছেলে বা মেয়ের বয়স ২১
হয়ে গেলেই বা মেয়েদের

বয়স ১৮ ছুলেই হাতে
আসবে এক থোক টাকা।
আর ঠিক সেই সময়েই
ছেলেমেয়ের সবচেয়ে বেশী
প্রয়োজন পড়ে মূলধনের।

আরো একটা বিস্ময়
উপহার: নির্দিষ্ট কিছু দিন
পর পর সৌভাগ্য লটারী
তাদের সামনে এনে দেয়
বামপার কাশ পুরস্কার

লাভের সুযোগ।

এটা একটা বাড়তি বোনাস।
স্বপ্ন সত্যি হয় ইউনিটে



**ইউনিট ট্রাস্ট
অব ইন্ডিয়া**

(একটি সরকারী ক্ষেত্রের আর্থিক সংস্থা)

গ্রন্থান কার্যালয় : কোম্বাই ৪০০ ০২০

আঞ্চলিক কার্যালয় : ৪ ফেয়ারলি ট্রেস, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ফোন : ২৩-২৩৯১, ২৩-১৬৩৮, ২৩-৮৮১৮, ২২-৮৭২৫

সঞ্চয় গড়ে তুলুন ইউনিটে ইউনিটে

জেনে নাও

হাই ওঠে কেন

শুধু, ঘুম পেলে যে হাই ওঠে তা নয়, একঘেয়ে কাজ বা একটানা কিছুক্ষণ পড়াশুনো করলেও হাই ওঠে।

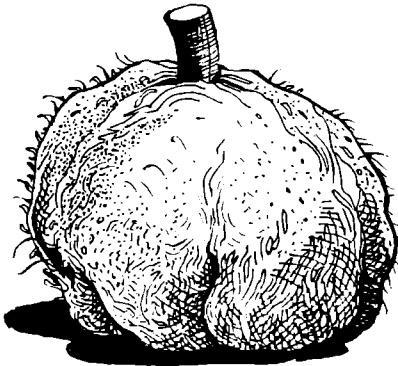
তাই না ?

হাই ওঠে কেন ?

ক্লান্তিতে বা একঘেয়ে কাজ করতে করতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হার কমে আসে। স্বাভাবিক অবস্থায় মিনিটে ১৮ বারের মতন আমরা প্রশ্বাস নিই আর নিশ্বাস ছাড়ি। যখন হার কমে আসে, তখন কী হয় ?

শরীর থেকে আমরা কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়ি। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হার কমে এলে শরীর থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে আসার পরিমাণ কমে যায়। সেইজন্যে রক্তে আর দেহকোষে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিমাণে বেড়ে ওঠে।

এই বেড়ে যাওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্যে আমরা হাই তুলি। হাই তুলে আমরা বেশি বাতাস টানি। ছাড়িও বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড। ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমে আসে। আর এইভাবে স্থিতিবস্থা বা স্বাভাবিক অবস্থাটা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়।



ওল খেলে গলা ধরে কেন

ওল খেতে অনেকেরই ভাল লাগে। কিন্তু যদি গলা চুলকোয় ! এ-রকম একটা ভয় থাকে মনে মনে। ওল খেলে গলা চুলকোয় কেন ?

ওলের কোষে এক রকমের রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এর নাম ক্যালসিয়াম অক্সালেট। চিনির দানার যেমন একটা নির্দিষ্ট আকার আছে, তেমনি ওলের কোষের এই ক্যালসিয়াম অক্সালেটেরও আকারটা নির্দিষ্ট। এটা ছুঁচলো ধরনের। ফলে গলার শ্লেষ্মা-ঝিল্লিতে আটকে যায়। আর সেই জন্যে গলা ধরে।

অরূপরতন ভট্টাচার্য



বড়দিন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এসো এই উৎসবে,
আনন্দ করো ;
বলো, রাত ছোট হবে,
দিন হবে বড়।
বলো যে, এবারে ধীরে
কাটবে আঁধার,
ভয়ের রাত্রি ফিরে
আসবে না আর।
বলো, আজ সব শোক
দূরে চলে যাক,
জীবনের জয় হোক,
মৃত্যু মিলাক।
দেখেও দ্যাখো না যাকে,
কাছে তাকে টানো,
ভালবাসা দিয়ে তাকে
আপনার মানো।
তবেই তো শেষ হবে
সব হানাহানি,
বড় এই উৎসবে
শোনো এই বাণী।

ছবি : দেবাশিস দেব



ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট কবেছে আয়োজন, শীতে উষ্ণ-মধুরতায় ভরাবে সবাব শরীর-মন

চকোলেট সিঙ্গল !

এক কাপ ফুটন্ত গরম দুধে
তিন চা-চামচ ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং
চকোলেট মেশান আর সবাইকে
খাওয়ান—খোঁয়া ওঠা চকোলেট
সিঙ্গল কনকনে শীতে, শরীরকে
চাঙ্গা রাখার এক মধুর উপায় !

চকোলেট সুঅর্ল !

বেশ খানিকটা গরম দুধে তিন
চা-চামচ ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং
চকোলেট মিশিয়ে দিন—ওপর
থেকে দিন মধু ছাড়িয়ে ! এ এক
মধুর চকোলেট সুঅর্ল শীতের
দিনের সাদর-আহ্বান, ভরিয়ে
তোলে উষ্ণতায় দেহ-মন-প্রাণ !

চকোলেট নাটি !

গরম খোঁয়া ওঠা এক কাপ দুধে
তিন চা-চামচ ক্যাডবেরিস্
ড্রিঙ্কিং চকোলেট মিশিয়ে দিন !
কুচো-বাদাম ছাড়িয়ে দিন ওপরে !
চমৎকার চকোলেট নাটি !
উষ্ণ-মধুর চকোলেট মজাদার—
ঘরের পানে টানে বারবার !

চকোলেট স্পাইস !

একমগ গরম দুধে তিন চা-চামচ
ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট
দিন মিশিয়ে ! দাবুচিনি, জায়ফল
ও এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে নেড়ে
দিন—এ এক তাক লাগানো
চকোলেট স্পাইস ! শীতের দিনে
দেহ-মনে এনে দেয় উষ্ণতার
অনুরণন !

ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট ২০০ গ্রামের টিনেও পাওয়া যায় !



হারানো-প্রাপ্তি

অশোক বসু

এ লাইন সে-লাইন নানান লাইনের সঙ্গে কাটাকুটি খেলতে খেলতে আর ভৌসভৌস করতে করতে ট্রেনটা যখন একটা জংশন স্টেশনে এসে থামল, তখন সকালের রোদ্দুর ঝলমল করছে চারধারে। ডিটোর পাশে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে 'চা-গরম'কে ডাকলেন। চায়ের বদলে খবরের কাগজের হকার এল। একটু পরে চা-ও এল অবশ্য। ভদ্রলোক কাগজ কিনলেন, চাও খেলেন। তারপর খানিক বাদে ট্রেনটা যখন আবার চলতে শুরু করল, আর ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়ে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় চোখ বুলিয়ে দ্বিতীয় পাতাটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন, তখনই কাগজের দিকে তাকিয়ে ডিটো চমকে উঠল। হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলমে যে ছবিটা রয়েছে, সেটা নির্ভুলভাবে ডিটোরই ফোটো। গত বছরই তো নতুন ক্যামেরা কিনে ছোটকাকা ফোটোটা তুলেছিলেন। ফোটোর নীচে কী লেখা আছে, সেটুকুও দেখার সাহস হল না ডিটোর। ছবিটা দেখলেই ভদ্রলোক ডিটোকে ঠিক চিনে ফেলবেন।

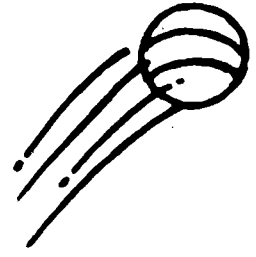
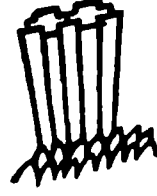
ডিটো ট্রেনের সব যাত্রীদের দেখল। সন্দেহজনক কোনো মুখ চোখে পড়ল না। কেউই তার দিকে তাকিয়ে নেই। আর নাকি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে শিয়ালদা এসে যাবে—একটু আগে একজনকে বলতে শুনেছিল। শিয়ালদা এসে গেলেই ডিটো

নিশ্চিত। কলকাতার অত লোকের মধ্যে কে কাকে চেনে! খবরের কাগজের একটা ছোট্ট ছবির মুখ কে আর মনে রাখতে যাবে।

একটু পরে ডিটো আস্তে আস্তে মুখ ফেরাল। কী আশ্চর্য, ভদ্রলোক আরও কাগজের দ্বিতীয় পাতাটাই চোখের সামনে খুলে রেখেছেন। এ পাতায় এত পড়ার কী থাকতে পারে? ডিটো আবার ফোটোটা দেখল। হ্যাঁ, তারই ফোটো। এবার, একটু ঝুঁকে, কাগজের লেখাগুলোও দেখল। পনেরোই ডিসেম্বর থেকে নিরুদ্দেশ শ্রীমান সুমনকুমার মিত্র ওরফে ডিটোর সংবাদ চাওয়া হয়েছে। নীচে বাবার নাম, ঠিকানা।

ভদ্রলোক কি ডিটোর ছবিটা দেখেছেন? অবশ্যই এই কদিন ডিটোর চেহারার একটু উনিশ-বিশ নিশ্চয়ই হয়ে গেছে। জলপাইগুড়ি থেকে আসামে রাঙাপিসির কাছে, সেখানে দুদিন থেকে আবার পালিয়ে আসা, নিউ জলপাইগুড়িতে এসে দার্জিলিং-মেলে ওঠা, এই চার পাঁচ দিনের চূড়ান্ত অনিয়ম নিশ্চয়ই ফোটোর সঙ্গে তাকে অমিল করে দিয়েছে। কিন্তু, তা হলেও ফোটোটা খুব খেয়াল করে দেখলে ডিটোকে চিনে ফেলতে মোটেই অসুবিধে হবে না। সেই গতকাল সন্ধ্যাবেলা থেকে ডিটো ভদ্রলোকের পাশে বসে আছে, ভদ্রলোক টুকটাক কথা বলার সময় অনেকবার ডিটোকে দেখেছেন, মুখটা কি একটুও মনে থাকবে না?

নট-আউট



সুইঙ আর কাটার-এর জারিজুরি ফক্কা
গুগলী বা টপ্প স্পিন, সবতেই ছক্কা!

হুক, পুল, লেট-কাট, মার সব চোস্ত
বোলারেরা কাঁদ-কাঁদ, ফিল্ডার ত্রস্ত

এই ছোটে থার্ড ম্যানে, এই ছোটে কভারে
গেল! গেল! ধর! ধর! ফের চার, বাবারে!

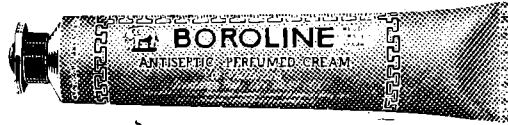
রান বাড়ে যত তার রোদ বাড়ে দশগুণ
মাথা করে ঝিমঝিম, ঘেমে নেয়ে হয় খুন।

সন্ধ্যায় ফেরে সব চেহারা কি অপরূপ!
রোদে পোড়া কলসানো, জামা ভিজে চুপচুপ।

নট আউট যে ব্যাটসম্যান হাসিখুশি মূর্তি
সেঞ্চুরী হাঁকড়িয়ে প্রাণভরা ফুর্তি।

একগাল হেসে বলে, এই নিন বোরোলীন
ভাল করে হাতে মুখে এফুনি মেখে নিন।

রোদ-জ্বালা, কাটা-ছড়া সেরে যাবে চটপট।
ফিল্ডিং-এ নামবেন, কাল ফের ঝটপট।



কাটা-ছড়া ও ত্বকের সুরক্ষার জন্য

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম



জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০৮৮

আর ঘণ্টা-দুই কোনোরকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই ডিটো বাঁচে। ভদ্রলোকও নিশ্চয় বেশিক্ষণ কাগজ পড়বেন না। কাগজের অন্যান্য পাতাও তো আছে। সেগুলোও নিশ্চয় পড়বেন। কিন্তু এখনও কিছুক্ষণ পরেও ডিটো দেখল ভদ্রলোকের চোখ এখনও দ্বিতীয় পাতাতেই। ডিটোর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। দ্বিতীয় পাতাতে তার ফোটো ছাড়া অন্য কোনো ছবিও নেই। পরিষ্কার, ঝকঝকে ছাপা। সবার আগে তার ছবিটাই নজর কাড়ছে। ভদ্রলোক এফুনি দেখবেন হয়তো। আর দেখেই—

ডিটোর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল খবরের কাগজটা ভদ্রলোকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। কাগজে এত পড়ার কী আছে? জানলার বাইরে নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, টেলিগ্রাফের পোস্ট, ট্রেনের ভেতরে কতরকমের মানুষ—এগুলোও তো দেখতে ভাল লাগা উচিত। তা নয়, ভদ্রলোকের চোখ ওই খবরের কাগজেই আর ওই দ্বিতীয় পাতাতেই নিশ্চল হয়ে আছে।

একটু পরেই ভদ্রলোক কাগজের পাতা ওপ্টাতেই ডিটো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, “ফার্স্ট পেজটা একটু দেবেন?”

ভদ্রলোক কাগজটা ভাঁজ করে ডিটোকে দিয়ে বললেন, “ফার্স্ট পেজ কেন, পুরো কাগজটাই পড়তে পারো। আমি চশমা আনি। চশমা ছাড়া খবরের কাগজ কেন, তোমার মুখটাই ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না।”

ডিটো অবাক হয়ে বলে, “এতক্ষণ তো কাগজ পড়ছিলেন?”

ভদ্রলোক হাসলেন, “পড়ছিলাম আর কোথায়, কাগজের দিকে তাকিয়ে বসে-বসে ঢুলছিলাম। সারারাত তো জেগেই বসে থাকতে হয়েছে।”

ভদ্রলোক ডিটোর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন, ডিটো তাড়াতাড়ি কাগজ পড়ার ভান করে মুখটা নিচু করল। ভদ্রলোক চশমা ছাড়া ভাল করে দেখতে না পারলেও, ডিটো কিন্তু নিজেকে কিছুতেই সহজ করে নিতে পারছিল না। ভাঁজের মধ্যে থাকলেও কাগজের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতে তার জলজ্যস্ত ছবিটা তো এখনও আছে। ছবিটা তো ভদ্রলোকের খোলা চোখের সামনে অনেকক্ষণ ধরা ছিল।

আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে ভদ্রলোক বললেন, “তুমি কলকাতায় যাচ্ছ, একাই?”

ডিটো মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলল।

“কলকাতাতেই বাড়ি?”

ডিটো মাথা নেড়ে ‘না’ বলল।

“বেড়াতে যাচ্ছ?”

ডিটো আবার মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলল।

“কলকাতায় কোথায় উঠবে?”

ডিটো কাগজের পাতাতে চোখ রেখে একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, “ঠিক নেই।” তারপর ভবানীপুরে ছোট্টকাচার বাড়ির ঠিকানাটা মনে পড়ে যেতেই বলল, “ভবানীপুরে ছোট্টকাচার আছেন। তার বাড়িতেও উঠতে পারি।”

“ভবানীপুর? ভবানীপুরে তো আমিও থাকি। কী নাম বলা তো তোমার কাকার?”

“নীলাদ্রি মিত্র।”

“আপন কাকা?”

“হ্যাঁ।”

বলেই ডিটো সতর্ক হয়ে গেল। ছোট্টকাচার নাম-ঠিকানা মুখ ফশকে বেরিয়ে গেছে। ভদ্রলোকের যদি চেনা-জানা বন্ধুলোক হয় আর সেই সূত্রে ডিটোর বাবার নাম জানা থাকে। ভদ্রলোক অবশ্য ছোট্টকাচারে চিনলেন না। একটু মনে করার চেষ্টা করে হতাশ হয়ে বললেন, “চিনলাম না। অবিশ্যি ভবানীপুর তো একটুখানি জায়গা নয়। কত লোক থাকে। কে আর সবাইকে চেনে।”

ডিটো চুপ করে রইল। ভদ্রলোকের আলাপ করার স্বভাবটা তার ভাল লাগছিল না। কী কথা বলতে কী কথা বেরিয়ে যাবে, কে জানে। অবশ্য ট্রেনে বাসে দূরের পথ একসঙ্গে যেতে যেতে সময় কাটানোর জন্যে মানুষকে আলাপী হতেই হয়। সেই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে গতকাল সন্ধ্যা আর আজ সকাল—এই দীর্ঘ সময় ভদ্রলোক ডিটোর পাশে বসে আছেন। একটু-আধটু কথাটখা তো বলতেই হবে। তাছাড়া ভদ্রলোককে দেখে মোটেই খারাপ লোক বলে মনে হয় না। ফিটফাট, প্যান্টজামা-পরা, মাঝবয়সের লম্বা-চওড়া মানুষ। তিনি ডিটোকে চেনেনও না, আগে কখনও দেখেনওনি, ডিটো যে রাগ করে বাড়ি থেকে চলে এসেছে, তাও তাঁর জানার কথা নয়। কিছুক্ষণ পরেই শিয়ালদা এলেই অনেক মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাবেন। ডিটো অহেতুক ঠুকে নিয়ে ভাবছে।

আসলে নিজের মনে ভয় আছে বলেই ডিটো ভদ্রলোককে সহজভাবে নিতে পারছে না। এ ক’দিন এখানে-সেখানে ঘুরে-ঘুরে সে হয়রান হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে চলে আসার সময় মনের যতটুকু জোর ছিল, তার এতটুকুও এখন অবশিষ্ট নেই। কলকাতায় সে যাচ্ছে, কিন্তু কোথায় থাকবে, কী করবে, কিছুই তার ঠিক করা নেই। কলকাতার কিছুই সে ভাল করে জানেও না। আগে ভেবেছিল ঠিকানা খুঁজে-খুঁজে ছোট্টকাচার বাড়িতেই চলে যাবে। কিন্তু এখন সে বুঝছে, সব খবরাখবর ছোট্টকাচার ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন। ছোট্টকাচারি অ্যালবাম থেকে ছবি ছাপিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তা হলে কী করবে সে?

সবই হয়ে গেল হঠাৎ। পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়ে ক্লাস নাইনে ওঠার পর বাবা যে নতুন সাইকেলটা কিনে দিয়েছিলেন, সেটা দিনবাজার থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিল। এই চুরি হয়েছে অবশ্যই ডিটোর দোষে। বাজারের ওরকম প্রকাশ্য জায়গায় চাবি না-দিয়ে রাখলে নতুন সাইকেল তো চুরি হবেই। কিন্তু তাই বলে বাবা এত বকবেন? সবুজরঙের চমৎকার ঝকঝকে নতুন র‍্যালের সাইকেলটা হারিয়ে ডিটোর কি কম মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল? কান্না পাচ্ছিল না তার? রাগে অভিমানে দুঃখে সে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। জলপাইগুড়ি থেকে সোজা আসামে গোয়ালপাড়ায় রাঙাপিসির কাছে চলে গিয়েছিল। কিন্তু পরের দিনই ডিটোর হঠাৎ এইভাবে চলে আসাটা রাঙাপিসি সন্দেহের চোখে দেখলেন। বাধ্য হয়ে সেখান থেকেও পালিয়ে এসে এ-গাড়ি সে-গাড়ি বদল করে কাল সন্ধ্যাবেলায় ডিটো দার্জিলিং-মেলে উঠে বসেছে। মাটির ভাঁড়ে নিজের জমানো যে-টাকাটা নিয়ে সে বেরিয়েছিল, তার সামান্যই অবশিষ্ট আছে এখন।

পাশের ভদ্রলোক জানলার বাইরে তাকিয়ে চুপ করে বসে

আছেন অনেকক্ষণ। ট্রেন তখন নদীনালা, ঘরবাড়ি, গাছমাটি পার হয়ে হু হু করে ছুটে যাচ্ছে। বেলা বাড়ছে আস্তে-আস্তে। কমে আসছে কলকাতার দূরত্ব। ডিটো তখনও কাগজ পড়ার ভান করে মুখ নিচু করে আছে। কলকাতা এসে গেলে তার আর কোনো ভয় নেই। কেউই তাকে চিনবে না।

আর কিছু সময় কাটিয়ে দিতে পারলেই সে বাঁচে।

“কাগজ পড়া হয়েছে তোমার?”

ডিটো তবু ভদ্রলোকের দিকে তাকাল না। শুধু কাগজের মাঝখানের পাতাগুলো বের করে ভদ্রলোকের হাতে দিল। প্রথম আর শেষ পাতা তার হাতেই রইল।

“তুমি বুঝি পেপার পড়তে খুব ভালবাসো?” ভদ্রলোক হাসলেন।

এ-ক্ষেত্রে ডিটো কেমন করে চুপ করে থাকে! কাগজে চোখ রেখে ডিটোকেও সম্মতিসূচক হাসতে হল।

গঙ্গা পার হয়ে দার্জিলিং-মেল দক্ষিণেশ্বরে এসে থামল। আর কিছুক্ষণ পরেই শিয়ালদা এসে যাবে। ভদ্রলোক পকেট থেকে টিকিট বের করে দেখলেন। টিকিটের দাম পড়ে বললেন, “ভাড়াটা বেড়ে গেছে দেখছি।” তারপর ডিটোর দিকে তাকালেন, “কী, টিকিট কেটেছ তো?”

কী আশ্চর্য, টিকিট কাটবে না কেন ডিটো! বলল, “কেটেছি।”

ভদ্রলোক বললেন, “কিছু মনে করো না, তোমার জামা-কাপড় আর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে হঠাৎ কোনো ভীষণ জরুরি কাজে এক-কাপড়ে খুব তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরতে হয়েছে। হয়তো টিকিট কাটার সময়ও পাওনি। টিকিট না থাকলে শিয়ালদা স্টেশনে আটকে দেবে।”

ডিটো আবার বলল, “টিকিট কেটেছি।”

কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন শিয়ালদা স্টেশন এলাকায় ঢুকল। ভদ্রলোক হাতঘড়িতে সময় দেখে বললেন, “প্রায় একঘণ্টা লেট। সাদার্ন অ্যাভিনিউ যেতে আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট। মানে বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে দশটা বেজে যাবে।”

স্টেশনে নেমে ভদ্রলোককে ডিটো দেখতে পেল না। অনেক মানুষের ভিড়, ব্যস্ততা আর কোলাহলের মধ্যে কে কোথায় চলে গেলেন, কে জানে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বের হবার দরজায় কালোকোট-পরা টিকিট কালেকটর দাঁড়িয়ে আছে। সবাই টিকিট দিয়ে গোট পার হচ্ছে। ডিটোর কোনো তাড়াছড়ো নেই। কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে, তারও কিছু ঠিক নেই। সে আস্তে-আস্তে, প্রায় সবার শেষে গিয়ে টি-টির হাতে টিকিট দিয়ে গোটের বাইরে এসে দাঁড়াল।

আর গোটের বাইরে এসে প্রথমেই যাকে দেখল, ডিটো খুব জানে, তিনি তার জন্যেই অপেক্ষা করে আছেন। ট্রেনের সেই ভদ্রলোক।

ডিটো কিন্তু একটুও অবাক হল না। আস্তে-আস্তে ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল। বলল, “কোথায় যেতে হবে আমাকে?”

ডিটোর কথা শুনে ভদ্রলোক প্রথমে অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন যেন। তারপর তারিফ-করা চোখে ডিটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, “আরে শাবাশ, তুমি ধরলে কেমন করে?”

ডিটো মাথা নিচু করে বলল, “আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে

আপনি আমাকে চিনে ফেলেছেন, কিন্তু সেটা আপনি আমাকে জানতে দিতে চাননি। চশমা ছাড়া খবরের কাগজের লেখা পড়তে পারলেন না, অথচ ট্রেনের টিকিটের লেখা পড়তে আর ঘড়িতে সময় দেখতে একটুও অসুবিধে হল না। প্রথমে বললেন ভবানীপুরে থাকেন, আবার পরে বললেন সাদার্ন সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে যাবে।”

ভদ্রলোক ডিটোর পিঠে হাত রেখে বললেন, “থ্যাক্স যু মাস্টার সুমন মিত্র ওরফে ডিটো, দারুণ তোমার অবজারভেশন। তোমাকে আমি আগেই বলতে পারতাম, কিন্তু তা হলে তুমি অনেকের মধ্যে ভীষণ লজ্জায় পড়ে যেতে। লোকেও ব্যাপারটা জেনে অহেতুক গুণ্ডগোল করত।”

ডিটোর ছোটকাকা নীলাদ্রি মিত্র খবর পেয়েই গোয়েন্দা-ডিপার্টমেন্টের অফিসার মণিময় সোমের বাড়িতে ছুটে এলেন। বললেন, “দাদার কাছ থেকে ট্রাক্কলে খবর পেয়েই আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। আজকের কাগজেই প্রথম বেরিয়েছে। কী ভাগ্যিস আপনি ওকে চিনতে পেরেছিলেন।”

মণিময় বললেন, “পুলিশে চাকরি করি, তার ওপর একেবারে খোদ গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্টে। স্বভাবতই খবরের কাগজের চুরি-ডাকাতি, খুন-নিরুদ্দেশ, এসব খবরেই চোখ যায় আগে। ছুটিতে বাড়িতে আসছিলাম। ট্রেনে কাগজ কিনে পড়ার সময় নিরুদ্দেশ কলমের ছবিটা দেখেই চমকে উঠেছিলাম। আমার পাশে বসে-থাকা ছেলেটির সঙ্গে দারুণ মিল। লক্ষ করে দেখলাম যে, আমি যতক্ষণ কাগজ পড়ছিলাম, ততক্ষণ সে ছটফট করছিল। আমি যাতে ওর মুখ দেখতে না পাই, সেজন্যে সে মুখ নিচু করে কিংবা অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত সে কাগজের ওই পাতাটা চেয়েই নিল। আমি যখন কাগজ পড়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম, তখন সে মাঝখানের পাতাটাই কেবল ফেরত দিল, আসল পাতাটা হাতছাড়া করল না। তা ছাড়া পেশাগত অভিজ্ঞতার জন্যে কারুর মধ্যে কোনো দুর্বলতা থাকলে আমাদের চোখ এড়ায় না, কে সমাজের কোন-শ্রেণীর মানুষ তাও বুঝতে পারি। কাগজে দেখলাম বাবার নাম হিমাদ্রি মিত্র। ছেলেটির মুখে ওর কাকার নাম শুনলাম—নীলাদ্রি মিত্র। ধ্বনিগত মিলের জন্যে দুটি নাম দুই ভাইয়ের হওয়াই স্বাভাবিক। ছেলেটি বলল কলকাতায় কোথায় সে উঠবে ঠিক নেই। কেন? একটা বাচ্চা ছেলে একা-একা কোনো ঠিকানা ছাড়া কলকাতায় যাচ্ছে কেন? অবশ্য একটা ব্যাপারে হিসেব মিলছিল না। ছেলেটি বাড়ি ছেড়েছে পাঁচ দিন আগে, এ ক’দিন তা হলে সে কোথায় ছিল? পরে অবশ্য ওর ময়লা জামাপ্যান্ট, না-আঁচড়ানো চুল, শুকনো মুখ দেখে অনুমান করে নিতে অসুবিধে হল না যে, এই ক’দিন ও এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করে কাটিয়েছে। আমি অবশ্য বরাবরই ওকে না-চেনার ভান করে ছিলাম, কিন্তু—”

ছোটকাকা বললেন, “কিন্তু—”

মণিময় ডিটোর দিকে তাকিয়ে সন্তোষে হাসলেন, “কিন্তু পরে বুঝলাম, শ্রীমান সুমনকুমার মিত্র আমার চেয়ে ঢের বড় গোয়েন্দা। ও ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে, আমি সব জেনে গেছি। কী বলো ডিটো, তাই না?”

ডিটো দারুণ লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করল।

ছবি : অনুপ রায়

ভূতের পাল্কি

অধীর বিশ্বাস



ভূবন ওঝার পসার বেড়েছে। আগের বাড়ি নড়িহাটি, এখন করেছে দরিমাগরোয়। বাড়ি বলতে এই কোনোরকমে মাথা গৌজার মতন একটা আস্তানা। শনের চাল। বাঁশের খুঁটি। চটার বেড়ায় মাটির গাঁথনি। দোয়ার পাড়ের পচা কাদা আর ধানের তুষ দিয়ে গাঁথনিটা বেশ জব্বর হয়েছে। ওই পাড়ার চৈতন ঘর বানানোর পুরো দায়িত্ব নিয়েছে। পরিশ্রম একটু বেশিই হল। তা হোক। গ্রামের মধ্যে একটা ওঝা-বদি থাকা ভাল। তাতে দশেরই মঙ্গল।

সেদিন বেলাবেলি বাড়িটার তদারকি করতে এসে ভূবন ওঝা তো থ ! এ কী ! দুদিন আগেও বকুলতলার নীচে দাঁড়িয়ে দেখে গেছে চৈতন কাদা আর তুষ মিশিয়ে মুণ্ডর পেটাচ্ছে। আজ তার কী চেহারা ! —এই ঘরটাই ভূবনের। নিজের বাড়ি। নতুন বাড়ি। ক'বছর বাদে আম-কাঁঠালে ভরে উঠবে। গোক পুষবে। হাশ্বা। সেই ডাক শুনতে আর বেশি দেরি

নেই।

ঘরের ভেতর ঢুকে ভূবন বলল, “কী করেছিস, চৈতন ? এ যে রাজপুরী।”

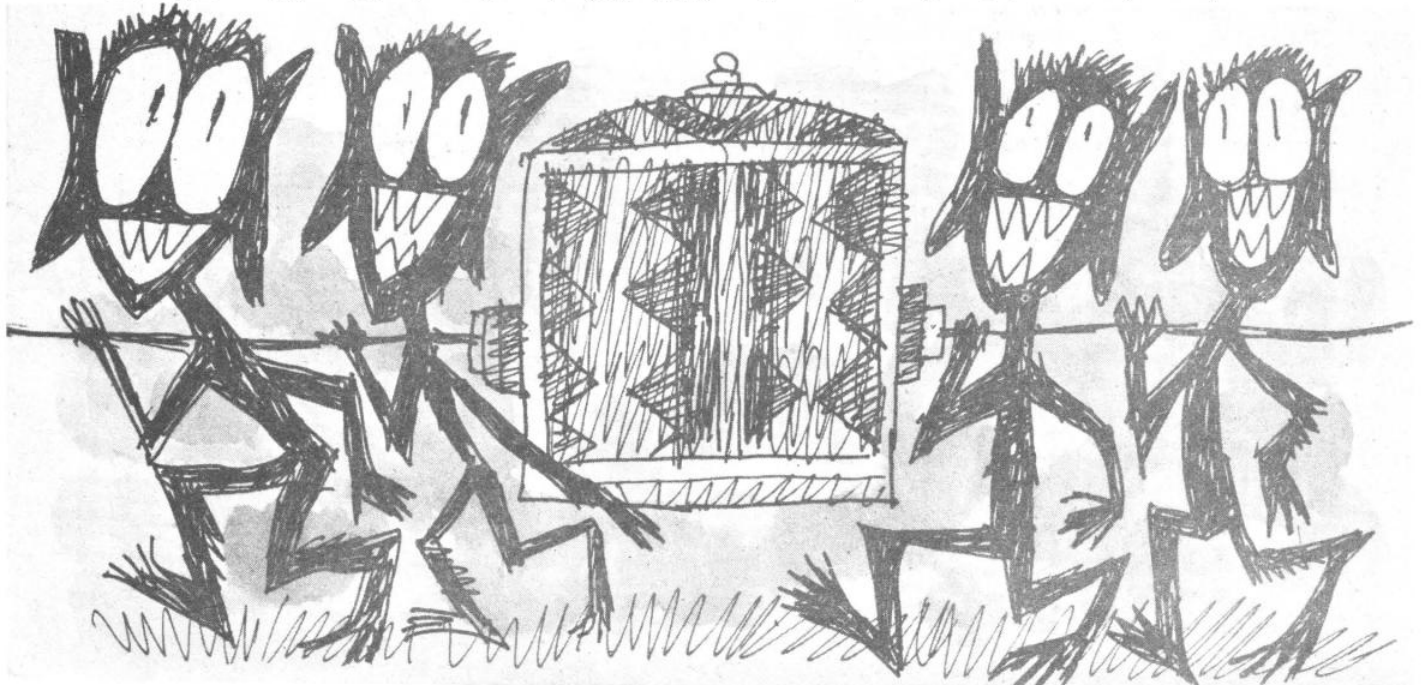
“ঠাট্টা দিও না, ওঝা। গায়ে-গতরে করতে হয়েছে। তোমার ভূতের মন্তর না যে, আলবিশ-তালবিশ দিলেই হল।”

“না রে। সতিই ভাল হয়েছে। ইচ্ছে হচ্ছে আজই গিমিকে নিয়ে চলে আসি।”

“তা, ভাল যখন বলছ, একটা বিড়ি খাওয়াও তো !”

ভূবন ওঝা আর চৈতন এখন সাম্যনাসামনি। বাইরে চন্ডির মাসের খাঁখাঁ রোদ। বুঝি আগুনের হুঙ্কা পায়চারি করছে। চালের তলায় নতুন মাটি। ঠাণ্ডা। বসে বেশ আরামই বোধ হচ্ছে। এমন সময় বিড়িতে টান দিতেও সুখ। ভূবন ওঝা মুখ খুলল, “এবার একটা কাজই বাকি।”

চৈতন আশ্চর্য হয়ে তাকায়। সবটাই তো হয়ে গেল।



খুচখাচ কাজকর্ম, কাটারি দিয়ে একটু-আধটু হাত চালালেই হয়ে যাবে। বলে, “আবার কী রইল?”

“এই তো। জানি তুই ভুলে যাবি, চৈতন। যে কর্ম করে খাব তার জন্যে আড়াল-আবড়াল চাই না?”

“আধ আঙুল জিভ বের করে দেয় চৈতন। বলে, “একদম খেয়াল ছিল না। তা, চিন্তা কোরো না। সাইডে একটা হাফবেড়া দিলেই তোমার নরমুণ্ডর আসন বসাতে পারবে।”

ভুবন ওঝার বাবরি চুল। কটা চুল। পাকা চুল। মাঝে-মাঝে হাওয়ায় জোর বাড়ছে। লম্বা মোচের গুচ্ছ ওঝার গলা ঝুঁয়ে যায়। চৈতন হাতের নাগালে পড়ে থাকা একটা কঞ্চির আগা কুড়িয়ে শিরদাঁড়া টান করে পিঠ চুলকায়। “ওঝা, এবার পাওনাগণ্ডার হিসেবটা কষে ফেলো। দু’দিন বাদে তো ঘরে উঠবে।”

ভুবন ওঝা কপালে চকচকে সিদুরের ফোঁটা নিয়ে সোজাসুজি তাকায়। কোনো কথা বলে না। ও বাড়িটা তো ভাইদের জন্যই রেখে আসতে হবে। একবার ভিটে ছাড়লে ভাগের আম-কাঁঠালও জুটবে না। বাবার বসতবাড়ি বেচতেও মন চায় না। তাই নতুন করে ঘর বানাতে যে এতটা লেগে যাবে, আগে ভাবেনি। কথায় আছে না—ঘর করতে কড়ি আর বেড়া বাঁধতে দড়ি। আজ ফিল্ডে নেমে তবেই বুঝতে পারল ভুবন।

“খুব তো বলেছিলি, মাথা দাও ওঝা। বাদবাকি চৈতন করে দেবে।—তা এখনই পয়সা পাচ্ছি কোথায়? আগে ঘরে ঢুকি। রোগীপত্তর খুঁজে দে।”

ওঝার কথাবার্তা বড় একটা সুবিধে ঠেকে না। তবে মাথা গরম করলে কাজ হবে না। চৈতন দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বলে, “টাউন থেকে একটা সাইনবোর্ড লিখে খেয়াঘাটে টাঙিয়ে দাও।—ভুবন ওঝার নতুন ঠিকানা। টুকটাক ব্যাধি নিরাময় হয়। ভূতে ধরায় পেশালিস্ট। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।”

“মন্দ বলিসনি, চৈতন।”

“খারাপ বলিনে তো। গাঁয়ের লোক হলে কী হবে। ঠগাবগা যা হোক পেটে একটু আছে। তা, লালসুতোর বিড়ি আর-একটা দাও দিনি।”

আজ বছরখানেক হল ভুবন দোয়ার পাড়ে এসেছে। এখানে এসে ভুবনের কতকগুলো অভ্যাস এসে গেছে। ঘুম থেকে উঠেই উঠানে দাঁড়িয়ে পুঁবমুখে একটা প্রণাম দেয়। তারপর আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙে দাঁত মাজতে মাজতে দোয়ার পাড়ের কচি ঘাসের ওপর খালিপায়ে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত প্রাতঃপ্রমণ। সন্ধ্যাবেলায় ঘাটে গিয়ে দাঁড়াতেই ভুবনের ভুঁড়িঅলা পেট, রুদ্রাক্ষের মালাসমেত পুরো চেহারাটা ভেসে ওঠে। চকচকে জলে কুলকুটির শব্দ হতেই চ্যলামাছ, পুঁটিমাছ চোখের সামনে কী ঘুরঘুর! ভুবন কান-কাঁপানো শব্দ তুলে জিভ পরিষ্কার করে। দাঁতনটা গভীর জলে ফেলতেই মাছগুলোর দৌড়ে যাওয়া দেখার মতো। এরপর ভূস ভূস গোটাকয় ডুব দিয়ে জপতপ সেরে কীসব মন্ত্র পড়তে পড়তে ভিজ়ে কাপড়ের জলে ধুলোর ওপর পায়ের ছাপ ফেলে বাড়ি ঢুকে যায়। ফুল তোলা। নতুন করে একখান সিদুর ভেঙে ঠাকুর-দেবতার কপালে দেওয়া, নিজের কপালে নিয়ে বাসীপেটে পুজোটুজো সেরে বাইরে বেরোতেই দেখবে কেউ

না কেউ এক ঘটি জল নিয়ে বসে আছে উঠানে। উঠানে নেমে গভীর গলায় বলবে, “কী নাম?”

চৈতনের সঙ্গে পাওনাগণ্ডা মিটে গেছে। ও দৈনিক সন্ধ্যাবেলায় বাজারে যাবার আগে ওঝার সঙ্গে দেখা করে। কোনো রোগীপত্তরের খবর থাকলে দেয়। আর দিলেই তো নগদ কাঁচা টাকা। ওঝাকে যেসব খবর-বার্তা দেয়, তাতে পকেট-খরচ চলে যায় চৈতনের। আর-একটু বেশি সময় থাকলে বিড়িটা, চা-টা তো বাঁধা। রোজই একটা না একটা খবর থাকবেই। রোগী না হোক, অমুক গ্রামে ভায়ে ভায়ে অশান্তি। বাড়ি বন্ধ দেওয়া। অমুকের নষ্ট ছেলটাকে ভাল করলে বিরাট বখশিশ। কিংবা নান্দোল গ্রামে ভূতের উৎপাত বেড়েছে। চৈতন তাই ভুবন ওঝার এক নম্বর শাগরেদ হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া সব কাজ ফেলে রেখেও যে-কাজটা চৈতনকে করতে হয়, তা হল গাঙকূলে হরির চায়ের দোকানে গিয়ে খোঁজ নেওয়া—কেউ নাম-ঠিকানা দিয়ে গেছে কিনা।

চৈতন সাজান সদারের দলে মুটেগিরি প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। কাঁহাতক আর তেল লবণ তুলে পারা যায়! তা ছাড়া অত ভারী বোঝা টানতে টানতে কাঁধটাও বসে যাচ্ছে। ওঝার সঙ্গে থেকে হিসেব করে দেখেছে হাটবারে প্রায় সমান রোজগার। লম্বা লম্বা পা ফেলে অনেককেই চৈতন টেকা দিতে পারে। তবে সে একটা লোককে পারে না; সে হল এই ভুবন ওঝা। অনেকবার পরখ করে দেখেছে, ওঝা হয়তো হুকুম দিল ভায়না গ্রামে যেতে, পরে যাবে নিজে। রোগীর বাড়ি অনেক সময় তাকেই সঙ্গে থাকতে হয়। কিন্তু এমন জায়গা আছে যেখানে ঘোড়ার গাড়ি, সাইকেল কিংবা নৌকো চলার খাল-বিলও নেই। ভরসা কেবল হাঁটাপথ। দেখা গেল চৈতন মাঝপথে যেতে না যেতেই ওঝা ঝাড়ফুক সেরে বাড়ি ফিরছে। পথের মাঝে চৈতনকে বোকা বানিয়ে বলে, “একটু মন দে, চৈতন। আমার সঙ্গে কাজ করতে দশ হাত আর দশ পা চাই। বুঝলি?”

সেটা না হয় মানা গেল। কিন্তু এমন অজ-গাঁয়ে এত তাড়াতাড়ি কী করে পৌঁছানো সম্ভব তা বড় রহস্য। লোকমুখে অবশ্য চাউর আছে ভুবন ওঝার পাঙ্কি আছে। ভূতের পাঙ্কি। ভূতরাই নাকি গান ধরে পাঙ্কি চালায়। আকাশ দিয়ে ভুবনের পাঙ্কি ছোটে। চৈতন পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। তবে না করলেও রহস্য একটা আছে ঠিক।

চৈতন তাই তক্কে তক্কে আছে। মনপ্রাণ আরও বসে গেছে ওঝার চালচলনে। দেখতে দেখতে তো গেল-হুণ্ডায় ভদ্ররের জমি বায়না নিল। একেবারে লিখিত-পড়িত। জমি থেকে মাটি নিয়ে ইট কাটা হবে, লাভের মধ্যে ভদ্ররের একটা পুকুর হবে। তা পয়সাকড়ি ভাল না হলে কি আর ইটের পাঁজা পোড়ানো যায়! মন মেজাজ নরম বুঝে একদিন কথাটা পেড়ে বসল। “ওঝা, তোমার দিন তো ফিরছে। বলেছিলাম না, এই ছিরিমানকে বিশ্বাস করো।”

ভুবন ঘোলাটে চোখ খুলে বলে, “মতলব কী চৈতন, বলে ফেল।”

“আন্দজ যখন করেছ, তাহলে বলেই ফেলি।”

“বল।”

“তোমার ভূতের পাঙ্কিতে একদিন চড়াবে?”

“এসব কথা কে বলল?”

“এ যেন আমার কথা ! গাঁ-সুদু লোক জানে । আগে বিশ্বাস করতাম না । এখন দেখছি ঠিকই ।”

ভুবন কোনো কথা বলে না । একটু চিন্তা দেয় মনে মনে । আবার ভাবে, চৈতন তো তারই শাগরেদ ।

“ঠিক আছে, মন দিয়ে কাজ কর । চড়াব একদিন । সাবধান । মনের ভেতর ভয় নেই তো ?”

“না ।”

“তিন সতি ?”

“তিন সতি । না । না । না ।”

“থাকলে কিন্তু ব্যাটারা ঠিক টের পায় । আর পেলেই তখন কিছু বলবে না । পাক্ষি যখন বাঁশঝাড় কিংবা শ্মশানমুখে যাবে তখন টুক করে—”

চৈতন বাধা দিয়ে বলে, “ব্যস । আর বলতে হবে না । বুঝে গেছি ।”

“ভয় নেই । তোকে কি আমি একা ছাড়ব ? মস্তপাঠ, গা-বন্ধ অনেক কিছুই করতে হবে, তার আগে ।”

চৈতনের মন-মেজাজ বেশ ভাল যাচ্ছে । ওঝা হুকুম দেবার আগেই বুঝি পারলে কাজটা সেরে ফেলে । কম কথা নয় । ভূতের পাক্ষি !

সন্কে ঘনি়ে এসেছে । চেনা পথ । চেনা জঙ্গল । ভুবন ওঝা বটতলার রাস্তা পেরিয়ে আরও ঘন জঙ্গলে ঢুকে যায় । আশশ্যাওড়ার ভাটিগাছের পাতায় ওঝার পায়ে বাড়ি লেগে শব্দ উঠছে । এই অন্ধকার গাছপালার ভেতর শুধু জোনাকির আলো । ঠিক যেন কাঁথা-সেলাই ছুঁচের মতন ঐক্যেবৈকে যাচ্ছে ।

তার মধ্যে বাদুড়ের ডানা ঝাপটানি । শেয়ালের ডাক । ভুবন আরও এগিয়ে যায় । গিয়ে সড়াগাছের গায়ে তিনবার চাপড় মারে । কথা বলা শুরু হয় । ভুবন ওঝা বাদে সবার কথাবার্তা কেমন কান্না-কান্না, নাকি-নাকি ।

“শুনতে চাই, কে বলে দিয়েছে আমি তোদের পাক্ষিতে চড়ি !”

“কেউ না । কেউ না ।”

“বললেই হল ?” ওঝা আরও রেগে যায় । “দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা ।”

ভুবন আসছে একা একা । কিন্তু শব্দ উঠছে বিকট জোরে । আশপাশের গাছপালা যেন আর একটাও আস্ত থাকবে না । এমনভাবে ডালপালা ভাঙতে লাগল, তখন ভুবন একবার দাঁড়িয়ে পড়ল । না । এভাবে চটানো ঠিক নয় । এই সন্কেবেলা গাঁয়ের লোক জড়ো হয়ে যাবে । তাতে অবশ্য যায় আসে না । কেননা ভূতগুলোকে কেউ দেখতে পারে না । তা হোক । অমন ফলস্তু গাছপালার ডালডুল ভাঙানো উচিত নয় । বলল, “ঠিক আছে । এবারকার মতন রেহাই দিলাম ।” তারপর কোনো শব্দ হল না । কেউ যে এ-তল্লাটে আছে তাও বোঝা গেল না ।

এদিকটায় লোকজন খুব কম । বাড়িমুখে দোয়া । দক্ষিণে গাঙকুল, বটতলা । আর এই বটতলায় এসেই ভুবন ওঝা ঝুরি-নামানো বটের গুঁড়ির মধ্যে নিজেকে আড়াল করে । ঝোলার ভেতর পাতলা ফিনফিনে সিল্কের আসন । সেটা

পেতে বসে শুধু তিন তুড়ি দিয়ে বলতে হবে—চালাও পাক্ষি হজিপুর । ব্যস । শাঁই শাঁই করে রাস্তাঘাট দিয়ে যাবে, মনে হবে একটা ঝড়ের হাওয়া বয়ে গেল । যতই লোকজন মাথা তুলে হঠাৎ চমকে তাকিয়ে দেখুক, কিছুই দেখা যাবে না । আসলে ভুবন তখন গুরুমশাই । ভূতরা তার শিষ্য । গুরুদেবকে নিয়ে চলে আদেশমতন ।



এমনভাবে দিবি চলল যাচ্ছিল। কিন্তু সংসারেও তো ঝগড়া হয়! যতই সে ওঝা হোক। তত্ত্বমন্ত্র নিয়ে এত মশগুল যে, ঠিকঠাক বাজারহাট হয় না। তাতে বউ তো রেগে যাবেই। রাগের কথা বলতেই পারে। তেমনই ঘটে গেল একদিন।

ভুবনের বউ কদিন ধরেই বলছিল চাল ফুরিয়ে আসছে। ভুবন উত্তরে বলে, ঠিক আছে—এক কথা। একই উত্তর। সেদিন এক বাড়ি ডাক পড়েছে। তক্ষুনি যেতে হবে। বাড়ি এসে বলল, “এক্ষুনি ভাত চাপাও। সন্ধ্যাবেলা গিয়ে আজ আর আসা হবে না।” বউ শুনল। কোনো কথা বলল না। ওদিকে ভুবন তো নিজের মনে ঝোলাটোলা গুছিয়ে রেখে সামনে গেছে। “কী হল? চুপচাপ বসে যে?” রাগের মাথায় বউটা বলেছিল, “আমার হাত-পা সেদ্ধ করে খাওয়াব?”

একটু বিবেচনা করে দেখল না ভুবন, সত্যিই তো চাল নেই। সেই রাগে ঘর ছেড়ে বেরোতে গেলে গুনিব হয়ে যেসব কাজ করতে হয় তা না করেই শুধু-মুখে বেরিয়ে পড়ল।

সেই এক জায়গা। অর্থাৎ বটতলার নীচে এসে ঝোলা থেকে কাপড় পেতে যেই বলল, জলদি চল, অমনি পাঙ্কি উড়ে চলল!

ভূতরা পাঙ্কি কাঁধে আজ এ ওর দিকে তাকাচ্ছে। ব্যাপার কী? আজ মনে হচ্ছে গুরুমশায়ের মন ভাল নেই। কথা নেই, বার্তা নেই। হাঁটু-নাচানো,—সেসব ফুর্তি কোথায় গেল? অন্য ভূত বলল, “চুপচাপ এঁগিয়ে চলে। পাঙ্কি যখন কাঁধে উঠেছে—”

“যাচ্ছি তোঁ। কিন্তু কৌন্দিকে?”

“সৌজা।”

যে সবার ছোট, সে বলল, “যখনই একটু খেলতে বঁসি, তখনই ওঁঝার ডাক—জলদি চলে। জলদি চলে।”

গাঙের পাড় ধরে মেছো ভূতদের ঘরবাড়ি ফেলে রেখে পাঙ্কি এগিয়েই চলল পশ্চিমের গ্রামে মজুমদার-বাড়ি। ও বাড়ির বড় বউকে ভূতে ধরেছে। ভূত ছাড়াই অনেক টাকা।

চার ভূতের মুরকিব, তার প্রথম থেকেই মনে খটকা। যাচ্ছে বটে, কিন্তু মাঝে-মাঝে পেছন ফিরে গুরুমশায়ের চোখ-মুখ লক্ষ্য করছে। বেশ বেতলা মানুষের মতন লাগে। পাঙ্কির দুটো দরজা খোলা। বাতাসে ওঝার চুল ওড়ে। বেতুল মানুষও বলা যায়। নিঃসাড় বসা। থাক। নিজের মনে থাক। জ্যাস্ত মানুষকে নিয়ে বাজে চিন্তা ঠিক নয়। তা ছাড়া, এসব ঘুণাক্ষরে টের পেলে আস্ত রাখবে না গুরুমশায়।

গেল হাটে বিশেষ তরকারি-হাটায় চৈতনের কাঁধ চেপে ধরেছিল। “কী রে খুব তো পাঙ্কি চড়ছিস।—আমাদের একটু চড়া।”

বড় বিপদ চৈতনের। আজকাল রাস্তাঘাটে সবাই ধরছে। কথা ঘুরিয়ে দেয় চৈতন। বলে, “খেপেছিস? ওই ভূতের নাগালে যেতে আছে? অনেক বন্ধি-ঝামেলা। পাঙ্কি চড়ায় বুকের পাটা চাই। সে হিম্মত হয়নি এখনও। ভয়ডর থাকলে জান বাঁচানো কষ্ট।”

সে-রাগিরে বাড়ি এসে চৈতন বেজায় রকমের ছটফট করছে। এতদিন ধরে সে ভুবন ওঝার সঙ্গে আছে। বলা যায় অনেক ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে তাকে। তবু শাস্তি থাকত

এখনও যদি এক-আধটা বিদ্যোটিদ্যে শিখে নিত কিংবা নিদেন পক্ষে পাঙ্কি চড়া। কিছুই হয়নি। কেন যে ওঝা মিথ্যে বলে দিন কাটাচ্ছে! ক্রোধ মতলব, কে জানে!

নদীর পাড় রেখে, জঙ্গল রেখে পাঙ্কি এখন সোজা পুঁটিবিলের মাঠ ধরেছে। বিরাট মাঠ। ফাঁকা মাঠ। নীচে সবুজ ধানের চারা। অল্পসল্প জ্যোৎস্না। আকাশে তুলোর মেঘ বড় সুন্দরভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। মনে হয় বুঝি যেতে যেতে চাঁদের গা মুছিয়ে দিচ্ছে মেঘ। এমন দৃশ্য ভুবন ওঝাকে আরও বিভোর করে তোলে। বাড়িতে যে এতটা অশান্তি হয়েছে তা আর মনে নেই। আকাশের ভেতর এমন ভেসে বেড়ানো, যেখানে খুশি যাওয়া ক’জনেরই বা ভাগ্যে জোটে! খুব আনন্দ হচ্ছে। এমন আনন্দ যে ঘরে না ফিরলেও চলবে। মাঝে-মাঝেই পাঙ্কিতে চড়ে, কিন্তু আজকের আমেজটাই অন্যরকম। এই শূন্য আকাশে বসে একটা হাততালিই বুঝি দিয়ে দেবে ওঝা।

মুরকিব-ভূত বেশ ক্লান্ত হয়ে আবার ফিরে তাকায়। “এ কী, গুরুমশাই বিড়বিড় করছে?—আঁচ্ছা!” বলেই বুড়ো-ভূতের কী আনন্দ। যেন হাতের নাগালে পেয়ে গেছে সাত রাজার ধন। মাথার খুলিতে টোকা দিতেই খুলে গেল বুদ্ধিটা। যেই হাঁ করল অমনি একটা পাখি ফুড়ত করে পাঙ্কির ভেতর দিয়ে উড়ে পালাল।

ভুবন ওঝা সেই পাখি দেখে ভীষণ ভয় পেল। কেঁপে উঠল। আর কেঁপে উঠতেই হুকুম হল কড়া গলায়। “এই থাম!”

কিন্তু থাম বললেই তো আর থামা যায় না। অনেক নিয়ম আছে। গুরুমশাই যতক্ষণ না আদেশ দেন। বুড়ো-ভূতের দাবড়ানি শুনে অন্যরা পাঙ্কিটা কাঁধ থেকে নামিয়ে গলা বাড়িয়ে পাঙ্কির ভেতরটা নজর করতেই বোঝা গেল ব্যাপারটা।

ভুবন ওঝা বা গুরুমশাই যেই হোক, এখন এ-মানুষকে বুঝি চেনাই যায় না। দরদর করে ঘামছে। “আর তোদের হুকুম করব না। আমাকে নামিয়ে দে। এই কান ধরছি। এই নাক মলছি।”

কিন্তু ভূতরা তো এখন শুনবে না। নাচে বিভোর হয়ে আছে ওরা। ভুবন আবার বলে, “মন্ত্র পড়তে ভুলে গেছি বলে তোরা আজ শাস্তি দিবি?—দোহাই, নামিয়ে দে।”

পাঙ্কিটা পুঁটিবিলের মাথায় ঝুলছে। চারপাশে ভূতের নৃত্য। “গুরুমশাই, ওঁঝামশাই/এবার তৌমার রক্ষা নাই।”

ভুবন ওঝার হৃদিস মিলল দু’দিন পর। মিলল সেই বটগাছের নীচে। যেখানে বসে ভুবন মন্ত্র পড়ে তিন তুড়ি দিয়ে বলত—চালাও পাঙ্কি হজিপুর—

ভুবন ওঝাকে দেখতে এত লোক আসবে কেউ কল্পনাও করেনি। কেউ বলল, আমাদের খুব ক্ষতি হল। হাজার হোক গ্রামের ওঝা। কিন্তু কী করে এটা হল, ভাববার কথা। কেউ বলল, ভূতরাই বাগে পেয়ে মেরে রেখেছে। এতদিন ব্যাটারা খুব খেটেছে তো!

বিশেষ নামের সেই লোকটা চোখের জল মুছিয়ে চৈতনের কাঁধে হাত রেখে বলল, “ঠিকই বলেছিলি, চৈতন। ভূতের পাঙ্কি চড়তে বুকের পাটা চাই!”

ছবি : দেবশিস দেব

দুঃখী হাতি পোলেপোলে

মঞ্জরী লাহিড়ী

পোলেপোলে একটি হাতির নাম। অল্প বয়স থেকেই সে খুব বিখ্যাত। 'An ELEPHANT CALLED SLOWLY' নামে একটি সিনেমায় সে-ই ছিল মুখ্য তারকা। সোয়াহিলিতে 'পোলেপোলে' কথাটার মানে 'আস্তে-আস্তে'। কেনিয়ার ভাষা সোয়াহিলি।

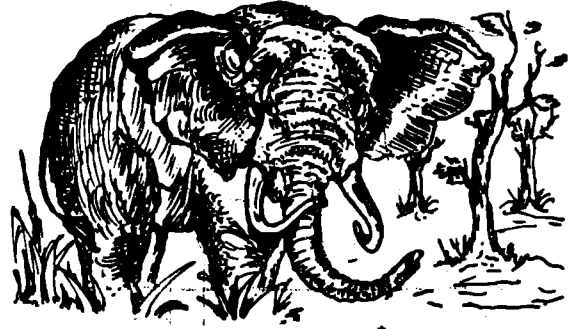
যখন পোলেপোলে লগুন চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হয়, তখন তাকে পোষ মানানোর কোনো চেষ্টা করা হয়নি। ১৯৬০ সালের আগে যে-সব হাতিকে লগুন চিড়িয়াখানায় পাঠানো হত, সাধারণত তাদের একটু পোষ মানিয়ে নেওয়া হত। কিন্তু পোলেপোলেকে যখন আনা হয়, তখন তাকে বুনো থাকারই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এরপর লগুন চিড়িয়াখানায় সে আস্তে-আস্তে বড় হতে লাগল, এবং যত বড় হতে লাগল, ততই চিড়িয়াখানার জীবন পোলেপোলের কাছে দুঃসহ বোধ হতে লাগল। কোনো লোকজনের কাছে আসা ও একদমই পছন্দ করত না।

একটা বিশাল বড় জায়গায় পোলেপোলেকে রাখা হয়েছিল। ওর সঙ্গী ছিল আরেকটি হাতি। তার নাম টোটো। সোয়াহিলি ভাষায় 'টোটো' মানে 'বাচ্চা ছেলে'। পোলেপোলের মনখারাপের সময় শুরু হত টোটো মারা যাবার পর থেকেই। টোটো হঠাৎ মারা গেল, এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই যে-সব রক্ষক ওদের দুজনের দেখাশোনা করতেন, তাঁরা অবসর গ্রহণ করলেন। পোলেপোলে তার নতুন রক্ষকদের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা করতে রাজি হত না।

শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন, পোলেপোলেকে সরিয়ে অন্য আরেকটা চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে হবে, যেখানে সে আরও বেশি জায়গা পাবে ঘুরে বেড়াবার। যেখানকার পরিবেশ অনেকটাই ওর জন্মস্থান কেনিয়ার জঙ্গলের মতো।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করার ব্যাপারে সমস্যা একটাই—পোলেপোলেকে খাঁচায় ভরতে হবে। তা না হলে এক চিড়িয়াখানা থেকে অন্য চিড়িয়াখানায় তাকে নিয়ে যাওয়া যাবে কীভাবে? এবং সেই খাঁচা হবে একদম আঁটো-সাঁটো, যাতে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় গাড়ির দুলুনিতে পোলেপোলে ধাক্কা না খায়।

এরপর বেশ কিছুদিন চিড়িয়াখানায় পোলেপোলের রক্ষকরা অভ্যেস করাবার জন্য গরাদবিহীন বাস্ত্রের মতো একটা জায়গায় পোলেপোলেকে খেতে দিতেন। যাত্রার কয়েকদিন আগে এক সন্ধ্যাবেলায় পোলেপোলেকে খাবার খাওয়ানোর পর পশুচিকিৎসক এসে ওকে ঘুমিয়ে পড়বার জন্য একটা ইঞ্জেকশন দিলেন। ঘুমন্ত পোলেপোলের গরাদবিহীন খাঁচায় গরাদ গাঁথা হল। কারণ, এবার যাবার আগের কয়েকদিন পোলেপোলেকে এই ছোট্ট খাঁচায় দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যেস করতে হবে, এবং এইভাবেই ওকে ওর নতুন বাসস্থান



সেই খোলামেলা চিড়িয়াখানাটিতে পৌঁছতে হবে।

একসময় পোলেপোলের ঘুম ভাঙল সেই ছোট্ট খাঁচার মধ্যে। প্রথমে মাথা দিয়ে গরাদ ভেঙে বেরুবার চেষ্টা করেছিল। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে গরাদগুলোর তলা দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। তাতেও ব্যর্থ হয়ে পোলেপোলে আস্তে আস্তে খাঁচার মধ্যে বসে পড়ল।

যখন একসময় পোলেপোলের রক্ষকেরা বুঝতে পারলেন যে, সে আর উঠে দাঁড়াবে না, তখন স্থির করা হল, খাঁচা ভেঙে ওকে বার করা হবে। দুর্বল পায়ে কোনোরকমে রক্ষকদের সাহায্যে পোলেপোলে ভাঙা খাঁচা থেকে বার হয়ে এল। পশুচিকিৎসক তখন ভালভাবে পরীক্ষা করবেন বলে আবার ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়ালেন পোলেপোলেকে। পরীক্ষা হল, পোলেপোলেরও ঘুম ভাঙল, কিন্তু সে আর উঠে দাঁড়াল না। পোলেপোলে একটু-একটু করে মারা যাচ্ছিল।

লগুন চিড়িয়াখানার মুখ্য পশুচিকিৎসক মিঃ ডেভিড জেন্স বললেন, পোলেপোলে যে আর উঠে দাঁড়াতে পারল না, তার কারণ ইচ্ছাশক্তির অভাব, মানসিক চাপ, অপরিমিত ক্রান্তি ও পেশীর দুর্বলতা। তাই ইঞ্জেকশন দিয়ে পোলেপোলেকে চিরদিনের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হল।

পোলেপোলে যে ফিল্মে অভিনয় করেছিল, সেটি একসময়কার একটি বিখ্যাত ছবি। এই ছবির মূল বস্তু্য ছিল, পোষ না মানা বুনো জন্তুরাই অনেক বেশি সুখী। এই ছবি তোলার আগে চিড়িয়াখানার সব হাতিকেই একটু পোষ মানিয়ে নেওয়া হত। এই সিনেমাটি বিখ্যাত হওয়ার পর থেকে চিড়িয়াখানার রক্ষকেরা হাতিদের পোষমানানো ছেড়ে দিলেন, কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন, এতেই হয়তো হাতিরা বেশি ভাল থাকবে।

এখন মনে হয়, সিনেমাটির পুরোটা নয়, খানিকটা সত্যি। পোষ-না-মানা হাতিরা খুব সুখেই থাকবে, যদি তারা জঙ্গলেই থাকে, যে-রকম আফ্রিকা বা এশিয়ার জঙ্গলে এখনও হাতির দল মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। যদি হাতিকে ধরে এনে শহরের চিড়িয়াখানায় রাখতে হয়, তা হলে কিন্তু তাদের একটু পোষ মানিয়ে নেওয়াই ভাল।

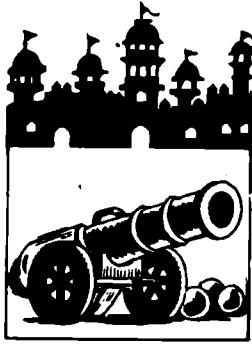
পোলেপোলের বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর। চিড়িয়াখানাগুলোয় ষাট বছরেরও বেশি বড়ো হাতিরা বেঁচে থাকে। পোষ-না-মানানো পোলেপোলে চিড়িয়াখানার বন্ধ জায়গায় মনে-মনে এক ভারী দুঃখী হাতি ছিল।

লগুন পশুশালার রক্ষকরা এখন কোনো নতুন হাতি এলেই তাকে আগে একটু পোষ মানিয়ে নেন। পোলেপোলের মতো একটি ছোট্ট দুঃখী হাতির অকালমৃত্যু তাঁরা আর চান না।

ছবি : পরমেশ পুরকায়স্থ

কলকাতার পুরনো হোটেল

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত



মুখুজ্জেশায় সেকালের খানু গোয়েন্দা পুলিশ। প্রায় দেড়শো বছর আগেকার কথা। তখন তো কলকাতার বাইরে হোটেল কিংবা থাকবার জায়গা বিশেষ ছিল না। লোকজনের যাওয়া-আসাও এত ছিল না। তাহলেও যারা সরকারি চাকরি করতেন তাঁদের তো ঘুরে বেড়াতেই হত। থাকবার খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদেরই যথাসম্ভব করে নিতে হত, আরও কিছু বছর আগে কয়েক মাইল পরে-পরে চটি পাওয়া যেত, চটিতে থাকবার অনেক অসুবিধা ছিল। কোথাও কোথাও চটিদারের সঙ্গে ডাকাতদের ব্যবস্থা ছিল। সে-রকম চটিতে টাকা-পয়সা প্রাণ কিছুই নিরাপদে থাকত না। ধরা যাক, মুখুজ্জেশায় সরকারি কাজে বর্ধমান জেলায় গিয়েছেন ডাকাত ধরতে। বেশির ভাগ সময় যারা মুখুজ্জেশায়ের মতো কাজ করতেন তাঁদের সঙ্গে কখনও-কখনও একজন লোক থাকত। সে রান্নাবান্নার সময় সব গুছিয়ে দিত, ফাই-ফরমাশ খাটত এবং ডাকাত ধরবার সময় সাহায্য করত। ইচ্ছা করলে অনেক সময় মুদির দোকানে এক রাত্রি দু-রাত্রি থাকা যেত। চাল ডাল নুন তেল কাঠ মুদির কাছ থেকে কিনতে হত। মুদিরা রান্নার বাসনও ভাড়া দিত। যেসব জায়গায় বড় বড় জমিদার ছিলেন সেখানে অতিথিশালা থাকত। সেখানেও আশ্রয় পাওয়া যেত, রান্না-করা খাবারও অন্দরমহল থেকে আসত, কখনও-কখনও দেবতার ভোগ। ব্রাহ্মণ অতিথি হলে একটু বাড়তি খাতির পাওয়া যেত।

ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ইংরেজদের শাসন তখন ভালভাবে গেড়ে বসেছে। ইংরেজদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। যুদ্ধবিগ্রহের জন্য লোক দরকার, শাসনের কাজের জন্যও অনেক লোক দরকার। তাছাড়া অনেক ইংরেজ তখন এদেশে বসতি আরম্ভ করেছিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। এত লোকের থাকবার ব্যবস্থা কী-রকম ছিল? কলকাতায় কয়েকটি ভাল হোটেল ছিল। কলকাতার সবচেয়ে পুরনো হোটেল কী বলা মুশকিল, তবে অনেকদিন আগে কলকাতার দক্ষিণে ফলতা গ্রামে একটি ইংরেজি ধরনের হোটেল ছিল। এখানে হোটেল করবার অর্থ স্পষ্ট। তখন ইয়োরোপ থেকে অনেক জাহাজ ফলতায় এসে থামত। জাহাজের যাত্রীরা অনেক সময় ফলতায় রাত্রিটা কাটিয়ে যেতেন। বিশপ হিবার নামে একজন নামকরা পাদ্রি লর্ড আমহার্স্টের সময় এ-দেশে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি এ-হোটেলে থাকেননি। তাহলে এই হোটেলের ভাল বর্ণনা পাওয়া যেত। তিনি শুধু বলেছেন, এটি ইংরেজি ধরনের হোটেল। এছাড়া বিশেষ কিছু জানা তাঁর সম্ভব হয়নি। এই হোটেল কতদিন টিকেছিল তাও জানবার উপায় নেই।

বোধহয়, কলকাতার সবচেয়ে পুরনো হোটেল যা কয়েক

বছর আগে পর্যন্ত টিকে ছিল তার নাম স্পেনসেস হোটেল। স্পেনসেস হোটেল রাজভবনের খুব কাছে। রাজভবনের উত্তর দেউড়ি থেকে সোজা বড় রাস্তা আগেকার ট্যান্ড স্কোয়ার, পরের ডালহৌসি স্কোয়ার এবং বর্তমান বি বা দী বাগ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। রাজভবনের দরজা থেকে চার-পাঁচ মিনিট হাঁটলেই রাস্তার বাঁ দিকে হোটেলের বড় বাড়ি। এখন দরজা বন্ধ, রাস্তার দিকে খানিকটা জায়গা টিন দিয়ে ঘেরা রয়েছে। এখানকার খাবারদাবার বেশ পুরনো, ইংরেজদের খাবারদাবারের মতো। শৈশবের দিকে দেখলে মনে হত, হোটেলটার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তারপর একদিন কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আর খোলেনি। বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে আসবার পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই হোটেলে এসে উঠেছিলেন এবং কিছুদিন থেকেওছিলেন। আর একজনের কথা বলা যায়, তাঁকে অবশ্য খুব বেশি লোক জানতেন না। তিনি হবসসাহেব। এক সময় সেনাবিভাগে চাকরি করতেন, পরে অবসর নিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারে একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকান করেছিলেন। পুরনো কলকাতার উপর হবসসাহেবের কয়েকটি বই আছে। বইগুলি সুখপাঠ্য। হবসসাহেব বছর-পনেরো আগে মারা গিয়েছেন। তাঁকে অনেকে দেখেছেন, সন্ধ্যাবেলায় টৌরঙ্গি-পার্কস্ট্রিটের মোড়ে টৌরঙ্গির দিকে তাকিয়ে আছেন, লোকের আসা-যাওয়া দেখছেন।

আর একটি পুরনো হোটেল উইলসনসাহেবের হোটেল। এই শতাব্দীতে তার নাম বদলে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল হয়েছে। আর একটি হোটেল ছিল তার নাম ভুলে গিয়েছি, পুরনো কাগজপত্র থেকে উদ্ধার করা সহজ নয়। সিপাহিযুদ্ধের সময় এই হোটেলটির কথা পুরনো ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজ-এ দেখা যেত। হোটেলটি ধর্মতলা স্ট্রিটে (এখনকার লেনিন সরণি) রাস্তার দিকে ছিল। পুরনো কাগজের বর্ণনা পড়ে আমার অনুমান, এখন যেখানে ওয়াশেল মোল্লার দোকান তার খুব কাছে হতে পারে। হোটেলটি বেশি দিন চলেনি। বোধহয় এই শতাব্দীর প্রথম দিকেই তার অস্তিত্ব ছিল না। শনি-রবিবার একটু শান্তিতে কাটাতে হলে আগেকার ইংরেজরা চন্দননগরে যেতেন। সেখানে অন্তত দুটি চলনসই কিম্বা ভাল হোটেল ছিল। চন্দননগর তো অনেকদিন পর্যন্ত ফরাসি রাজ্যে ছিল। ফরাসিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লর্ড ক্লাইভ আসবার পরেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু চন্দননগরে গেলে মনে হত ইংরেজ-শাসনের বাইরে অন্য পরিবেশ। সেদিন পর্যন্ত চন্দননগরের উপর ফরাসিদের প্রভাব একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি।

এইসব হোটেলে থাকা বড়লোক ছাড়া কারুর পক্ষে সম্ভব হত না। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে বড় হোটেলের থাকা-খাওয়ার খরচ ছিল দিনে দশ-বারো টাকা। তখনকার দিনে অবশ্য দশ টাকা অনেক টাকা। যেসব অল্পবয়সী ইংরেজ চাকরি নিয়ে এদেশে আসত তাদের নিজেদের মাইনে থেকে



গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল (আগে ছিল উইলসনসাহেবের হোটেল)

এ-টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাদের অবশ্য টাকা পাওয়ার অনেক উপায় ছিল। জাহাজ ঘাটে দাঁড়ালে যারা ভিড় করে আসত তাদের মধ্যে অনেকের উদ্দেশ্য ছিল নতুন লোকদের কাছে চাকরি যোগাড় করে নেওয়া। আর আসতেন সরকাররা। তাঁরা ইংরেজদের টাকা ধার দিয়ে, বাড়ির আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়ে গুছিয়ে বসাতেন। বাড়তি টাকা তাঁরাই সুদে ধার দিতেন। তাঁদের টাকা বিশেষ মার গিয়েছে বলে শুনিনি।

সাধারণ সৈন্যরা অবশ্য ফোর্ট উইলিয়মের ভিতরে ব্যারাকে থাকত। পরে ব্যারাকপুরে যখন ইংরেজদের ছাউনি হল তখনও অনেক সৈন্য সেখানে থাকত। কিন্তু যারা কেরানি হয়ে আসত, পরে অবশ্য দু-একজন গভর্নর-জেনারেল পর্যন্ত হয়েছেন, তাদের অনেক অসুবিধা ছিল। ট্যাক্স স্কোয়ারের পূর্ব দিকে কয়েকটি গলি ছিল, এখনও আছে। সেসব জায়গায় পানাহারের ব্যবস্থা ছিল। গলিগুলোর বিশেষ সুনাম ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইচ্ছা ছিল না যে তাদের অধীনে যারা কাজ করে তারা এইসব জায়গায় থাকে। যখন রাইটার্স বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে তখন সরকারের ইচ্ছা ছিল এইখানে কোম্পানির লোকজনরা বাস করবে, অফিসের কাজে ব্যবহার করা হবে না, কিন্তু থাকার জায়গার বদলে এটি কেরানিপাড়া হয়ে দাঁড়াল। একবার কেবল কিছুদিনের জন্য কোম্পানির লোকদের ওখানে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। যাই হোক, যে-উদ্দেশ্যে বাড়ি করা হয়েছিল সে-উদ্দেশ্য কিছুদিনের জন্য হলেও পূর্ণ হয়েছিল।

পরবর্তী কালে আরও বড় হোটেল হয়েছে, যেমন, গ্র্যাণ্ড হোটেল। চৌরঙ্গি-ধর্মতলার মোড়ে ছিল ব্রিস্টল হোটেল। এটি প্রধানত রেস্টোরাঁ, কেবল দু-একটি থাকবার ঘর ছিল। এই সব হোটেলে না থেকেও রেস্টোরাঁয় খাওয়া যেত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত কোথাও লাঞ্চ খেতে দেড় টাকার বেশি খরচ পড়ত না। যত ইচ্ছা খাওয়া যেত। কোনো-কোনো রেস্টোরাঁয় কুড়ি-পঁচিশ পদের বেশি খাবার দিত। এত বেশি পদ একসঙ্গে খাওয়া সম্ভব নয়। খরচ কিন্তু সেই দেড় টাকা। ১৯৩৯-৪০ সালে দেড় টাকা কি খুব বেশি টাকা হল? এত রকম খাবারের কথা ভাবলে সে-কথা বলতে হচ্ছে করে না।

একটি অবিবাহিত কথ্য বলি। যুদ্ধের সময় যখন কলকাতায় অনেক বিদেশী সৈন্যর ভিড় হয়েছিল তখন চৌরঙ্গির একটি বিখ্যাত রেস্টোরাঁ বিকালের কফি দিত। শুধু কফি নয়, তার সঙ্গে আবার এক প্লেট ছোট 'সসেজ'। সবসুদ্ধ দাম চার আনা। ভাবতে পারো?

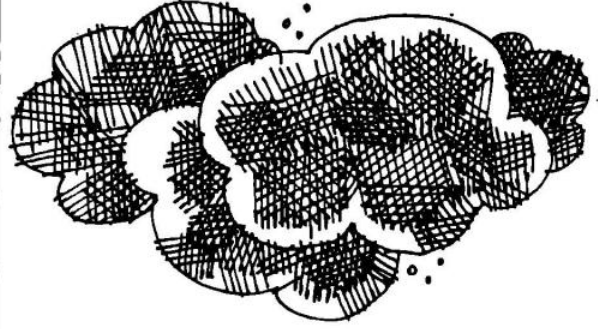
মেঘের বাড়ি

হিমাংশু জানা

তোমরা মানো আর না-মানো,
মেঘের বাড়ি কোথায় জানো?
এই যে নদী, এরই শেষে,
ওই যে পাহাড়, ওর গা ঘেঁষে।

এক্কেবারেই মফস্বলে।
ভেতর-বাইরে ভর্তি জলে
ছোট্ট একটি নকশি কুঁড়ে।
তাল-সুপুরি কিয়দূরে।

চলো না যাই, ঘুরে আসি।
বিজুলি তো ওর আপন মাসি।
চতুর্দিকেই আলোর মেলা,
নাও, খাও আর ভাসাও ভেলা।



বেকুব টিকটিকি

সুজিত সরকার

মাটির টিকটিকি অতীব সুখে
মাটির আরশোলা ধরেছে মুখে।
সত্যি-টিকটিকি তাই না দেখে
বেরোয় দেয়ালের গর্ত থেকে।
অবাক হয়ে ভাবে, কাণ্ড এ কী!
করে না নড়াচড়া, খায় না দেখি!
নিকটে গিয়ে তার গন্ধ শোঁকে,
বেকুব হয়ে ফের গর্তে ঢোকে।



ছবি : দেবাশিস দেব

টিনটিন

পিছনের সিটের তলায়
ক্যালকুলাসকে লুকিয়ে
রেখেছিল। আমরা
বুঝতে পারিনি।



এখন আশ্রয় পাই কোথায় ?



এরোপ্লেন ? মনে হয় নামছে ! সত্যি তাই !



কাছেই কোথাও বিমানবন্দর
আছে। দেখা যাক।



কিন্তু প্লেনটা তো মাঠের মধ্যে নামল !



আরে, দেখেছ ?

সেই গাড়িটা !



গাড়ি থেকে ক্যালকুলাসকে
ওই প্লেনে তুলবে !



আরে, বিচ্ছু দুটো দেখছি
পিছু ছাড়েনি !



তাড়াতাড়ি প্লেনে উঠে পড়ো সবাই !



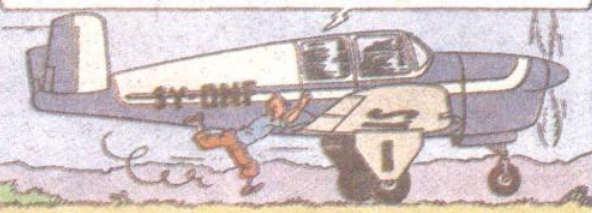
চালাও, বোল্ডফ !



তাড়াতাড়ি করো !



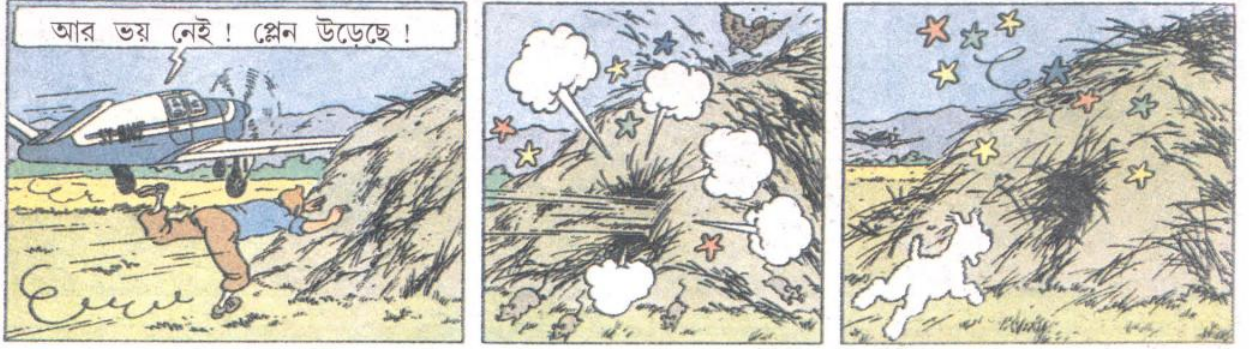
তাড়াতাড়ি ! আরও তাড়াতাড়ি !



উঃ, বাঁচলুম !



ক্যালকুলাসের কাণ্ড

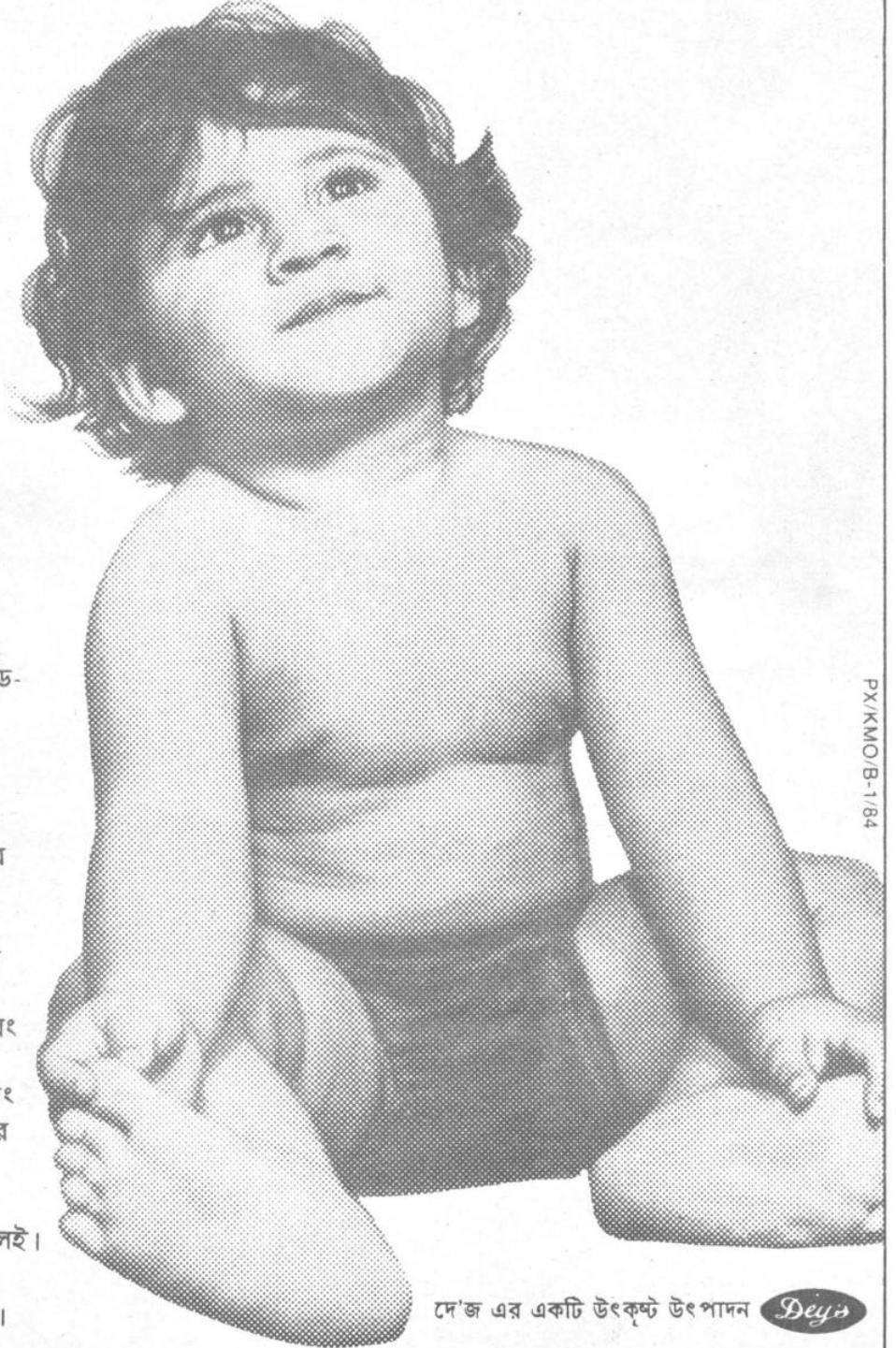


আপনার শিশুর চাই যত্ন এর কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল



ভিটামিন ই, এ এবং ডি-
সমৃদ্ধ কেয়ো-কার্পিন
ম্যাসাজ অয়েল।

অতি কোমলভাবে
আপনার শিশুর ত্বকের
যত্ন ও পরিচর্যার জন্য
সব কিছুই রয়েছে
কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ
অয়েল এ। এর অলিভ
অয়েল, ল্যানোলিন এবং
চন্দন তেল মিশ্রিত
বেসে রয়েছে ই, এ এবং
ডি ভিটামিন। আপনার
শিশুর ত্বকে রেশমের
মত নরম মসৃণতা
আনতে পারে এই তেলই।
পরিবারের সকলের
জন্যই সমান উপকারী।



দে'জ এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

De's

কালো পদারি ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর তার দিদি ইরানি এসেছে বর্ধমানের একটি গ্রামে। ওদের জ্যাঠামশাই চাকরি থেকে বিটায়ার করে এই গ্রামে এসে অনেক রকম বাগান করেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাস্তিরবেলা তিনি একা-একা লেবুবাগানে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে তিনি উধাও। এখানকার লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কোনোই সূত্র পাওয়া গেল না। দিপু তার দিদির দিকে কিছু না জানিয়ে মাঝরাতে পুকুরধারে একজন রহস্যময় লোকের দেখা পেল, তারপর আর দিপুও ফিরে এল না। সকালবেলা ইরানি আর ডাইকে দেখতে না পেয়ে দারুণ নার্ভাস হয়ে গিয়েও নিজেসঙ্গে সামলে নিয়ে গেল কাছাকাছি থানায় খবর দিতে। তারপর ...



এই থানাতে কোনো জিপগাড়ি নেই। হেঁটে যেতে হলে তো অনেকটা সময় লেগে যাবে। থানায় দু' তিনটে সাইকেল আছে। বড়বাবু থেকে কনস্টেবল সবাই সাইকেলেই যাতায়াত করে। বড়বাবু বললেন, “আমি আর খয়েরলাল দুটো সাইকেল নিই। দিদিমণিকে আমি বা খয়েরলাল ডাবল ক্যারি করতে

পারি।”

ইরানি বলল, “আমি সাইকেল চালাতে পারি। আমি আলাদা যাব।”

বড়বাবু বললেন, “তুমি? ইয়ে ... মানে ... এই গ্রামের রাস্তা দিয়ে তুমি তো চালাতে পারবে না, দিদিমণি! এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ...”

ইরানি বলল, “ঠিক পারব! কলকাতার রাস্তাও ভাঙা থাকে।”

বড়বাবু বললেন, “কিন্তু ... মানে ... গ্রামের লোক যে তোমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে?”

ইরানি রেগে গিয়ে বলল, “তা দেখুক না। যত ইচ্ছে দেখুক। তা বলে আমি সাইকেলের কেরিয়ারে চেপে যাব না। কিছুতেই যাব না।”

বড়বাবু বললেন, “এই রে, সাইকেল যে মোটে দুটো দেখছি। আর একটা সাইকেল আবার কোন্ ব্যাটা নিয়ে গেল!”

খয়েরলাল মিটিমিটি হাসছিল। এবারে সে পিচ্ করে খানিকটা পানের পিক ফেলে বলল, “আমি সাইকেল চালাতে জানি না।”

বড়বাবু সবিস্ময়ে বললেন, “আঁ!”

তিনি একবার ইরানির দিকে আর একবার খয়েরলালের দিকে তাকাতে লাগলেন। তারপর বললেন, “ওরে বাবা, তাহলে তো আমাকেই ক্যারি করতে হবে তোমাকে। টায়ার না ফেটে যায়!”

খয়েরলাল বলল, “আপনার একার ওজনে যদি টায়ার না ফাটে, তাহলে আমার একার ওজন আর কতটুকু? আমি তো রোগা-পাতলা!”

এর পর বেশ মজার দৃশ্য হল। একটা সাইকেলে দু'জন বয়স্ক পুরুষ, আর একটাতে কিশোরী ইরানি।

আসবার সময় ইরানি রাস্তা চিনে গেছে, সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল। তার দৃঢ় ধারণা হল, ফিরে গিয়েই দেখবে দিপু এসে গেছে। দিপুকে খুব একচোট বকুনি দিতে হবে। দিপু কেন এরকম চিন্তায় ফেলেছিল তাকে?

গ্রামের লোকেরা সত্যিই হাঁ করে অনেকে দেখছে ইরানিকে। ইরানি অবশ্য ভ্রূক্ষেপও করছে না। দেখুক যার যত ইচ্ছে। একটা কথা তার মনে হল, অবাক হলেই লোকের মুখ এরকম হাঁ হয়ে যায় কেন? গল্পে-উপন্যাসে সে পড়ে ‘বিশ্ফারিত চোখ’। কিন্তু সে-রকম চোখ তো সে দেখেনি কখনও!

জ্যাঠামশাইয়ের বাগানের কাছে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে নিশ্চয়ই দিপু ফিরে এসেছে। ইরানি জোরে প্যাডল চালাল।

না, দিপু আসেনি। কিছু গ্রামের লোক এসেছে বাগান থেকে কিছু কিনবার জন্য। তারা জানেই না যে, কদিনের মধ্যে এখানে কত কী ঘটে গেছে।

সাইকেল থেকে নেমেই ইরানি মধুকে জিজ্ঞেস করল, “আসেনি?”

মধু মুখ কাচুমাচু করে বলল, “কই, না। কত দিকে লোক পাঠালুম।”

ইরানির যত রাগ হচ্ছে দিপুর ওপর। তার এখনও ধারণা, দিপুর কোনো বিপদ হয়নি, সে ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছে!

বড়বাবু আর খয়েরলালও এসে পড়ল একটু বাদেই। বড়বাবু প্রথমেই সবাইকে ধমকাতে লাগলেন, এককড়ি কেন পালিয়ে গেল সেইজন্য! মধু আর কেউ তো আকাশ থেকে পড়ল। তারা তো দেখেছে এককড়িকে ইরানির সঙ্গে থানায় যেতে।

এককড়ির ব্যাঁকা-ব্যাঁকা কথা শুনে প্রথমে ইরানিরও বেশ বিরক্ত লেগেছিল লোকটির ওপরে। কিন্তু আজ সকালে একসঙ্গে যেতে-যেতে এককড়িকে তার বেশ পছন্দই হয়েছে। লোকটি অদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু খারাপ নয়।

বড়বাবু হস্তিত্ব করতে লাগলেন আর খয়েরলাল কারকে কিছু না জিজ্ঞেস করে লেবুবাগান, পেয়ারাবাগান সব ঘুরে দেখতে লাগল। পুড়ে যাওয়া পেয়ারাবাগানটার মাটি পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সে শুয়ে পড়ল দু'বার। পুকুরটাও চক্কর দিয়ে এল একবার। তারপর বলল, “নাঃ, এখান থেকে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। একজন বয়স্ক লোক আর একটি অল্পবয়স্ক ছেলে কেন এ-জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে?

ছেলেধরারা তো বুড়ো লোকদের ধরে না ? তবে নিশির ডাকের কথাটা একটু ভেবে দেখতে হয়।”

বড়বাবু বললেন, “যাঃ, ওটা তো কথার কথা বলেছি। রামবাবু বুদ্ধিমান, বয়স্ক লোক, তিনি নিশির ডাক শুনে বেরিয়ে যাবেন এ কখনও হয় ?”

খয়েরলাল বলল, “চলুন না। একবার নদীর ধারে সাধুকে দেখে আসা যাক। এখানে বসে থেকে তো কোনো লাভ নেই।”

বড়বাবু ইরানিকে বললেন, “তুমি দিদিমণি তা হলে এখানেই থাকো। আমরা সাধুবাবার সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি।”

ইরানি বলল, “না, আমিও যাব।”

বড়বাবু এরই মধ্যে বুঝে গিয়েছেন যে, এই মেয়েটি জেদ ধরলে সহজে ছাড়বে না। তিনি আপত্তি করলেন না। অন্যদের বলে গেলেন, দিপু যদি এর মধ্যে ফিরে আসে কিংবা তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়, তাহলে কেউ যেন দৌড়ে নদীর ধারে গিয়ে খবর দিয়ে আসে।

এখান থেকে নদীর ধারে যাওয়ার সরাসরি কোনো রাস্তা নেই। যেতে হবে মাঠ ভেঙে। সুতরাং সাইকেল নিয়ে কোনো লাভ হবে না। সাইকেল দুটো ওখানেই রেখে ওরা হেঁটে চলল।

ইরানি কক্ষনো সম্পূর্ণ অচেনা লোকদের সঙ্গে এরকম হেঁটে কোথাও যায়নি। খয়েরলাল লোকটিকে এখনও সে বুঝতে পারছে না। লোকটা কে ? দারোগাবাবু ওকে খাতির করছেন কেন ?

দুটো মাঠ পেরুতেই নদী চোখে পড়ল। তেমন কিছু নয়, বেশ ছোট নদী। জল খুব কম। একটা মস্ত বড় ঝুপসি বটগাছের নীচে একটা ছোট্ট চালাঘর। তার সামনে ধুনির আগুন জ্বলছে। একজন গেরুয়া পরা সাধু বসে আছেন সেখানে, মাথায় চুলের জটা খোঁপা বাঁধা। আরও দু’তিনজন লোক বসে আছে সেই সাধুবাবার সামনে।

এই জায়গাটা বোধহয় শ্মশান। কিন্তু সে-রকম কিছু ভয়াবহ মনে হয় না। মড়ার মাথার খুলি বা হাড়-টাড় ছড়িয়ে নেই কোথাও। শিয়াল-কুকুরও নেই। এক কোণে কিছু পোড়া কাঠ পড়ে আছে, সেটাই বোধহয় চিতা।

বড়বাবু তাঁর দলবল নিয়ে সাধুবাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি মুখ তুলে তাকালেন না। তিনি একজনের হাত দেখছেন, মন দিয়ে তাই-ই দেখতে লাগলেন।

অন্য লোকেরা থানার দারোগাকে দেখে বেশ হকচকিয়ে গেছে। যেখানে পুলিশ, সেখানেই গণ্ডগোল। নিরীহ লোকেরা তার ধরেকাছে থাকতে চায় না।

দারোগাবাবু একবার উঁ-ছ-ছ বলে গলা খাঁকারি দিলেন, তবু সাধুবাবা তা গ্রাহ্য করলেন না। খয়েরলাল সাধুবাবার ঘরটা উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে নিল। একবার নেমে গেল জলের ধারে। তারপর ফিরে এসে ইরানির পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, “ওই লোকটার হয়ে গেলে তুমি তোমার হাতটা একবার দেখাও তো।”

দারোগাবাবুর কাঁধ টিপেও সে সেই কথা জানাল।

যে-লোকটা হাত দেখাচ্ছিল, সে জিজ্ঞেস করছিল, তার জমি নিয়ে একটা মামলা চলছে, সেই মামলায় সে জিতবে কি না।

সাধুবাবা দু’হাত দিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, “নাঃ। অপরের জমি, তুমি জোর করে দখল করে নিতে চাও, তোমার লজ্জা করে না ?”

লোকটির বোধহয় আরও অনেক প্রশ্ন ছিল, কিন্তু পুলিশ দেখে সে আর উৎসাহ দেখাল না। হাত সরিয়ে নিয়ে সে পিছিয়ে বসল।

খয়েরলাল এগিয়ে এসে বলল, “সাধুজি, এই মেয়েটির হাতটা একটু দেখে দিন না। এ বড় দুঃখী মেয়ে। আপনার প্রণামী আমরা দেব।”

সাধুবাবা এর উত্তরে কিছুই বললেন না, চুপ করে রইলেন। খয়েরলাল ইরানিকে প্রায় জোর করেই বসিয়ে দিল সাধুবাবার সামনে। ইরানিও কেমন যেন হয়ে গেছে, সে নিজস্ব কোনো মতামত জানাতে পারল না।

সাধুবাবা ইরানির একটা হাত টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কী জানতে চাও বলো মা।”

ইরানি কিছু বলবার আগেই খয়েরলাল বলল, “ও বড্ড বিপদে পড়েছে। আপনি একটু উদ্ধার করার ব্যবস্থা করে দিন।”

সাধুবাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, “কী বিপদ তোমার মা ?”

খয়েরলাল বলল, “আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি তো সবই জানেন। আপনি তো ওকে দেখেই বুঝবেন ওর কী বিপদ।”

এবারে সাধুবাবা মুখ তুললেন। কটমট করে তাকালেন খয়েরলালের দিকে। তারপর বেশ জোরে ধমকের সুরে বললেন, “তুমি ফড়ফড় করছ কেন ? এ মেয়েটি কি বোবা, নিজের কথা নিজে বলতে পারে না। চুপ করে থাকো।”

বড়বাবু দেখলেন, তাঁকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। তিনি পরে আছেন পুলিশের পোশাক, তাঁর সঙ্গেই তো সবার প্রথমে কথা বলা উচিত। এমনকী এই সাধুবাবা তাঁর সামনেই তাঁর শাগরেদকে বকে দিচ্ছে।

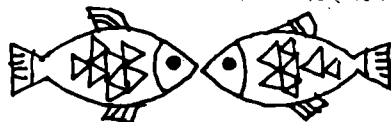
বড়বাবু বললেন, “এই যে, ইয়ে, সাধুবাবা, আমি এসেছি একটা এনকোয়ারি করতে ...”

সাধুবাবা দারোগাবাবুর দিকেও কটমট করে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, “আগে এই মেয়েটির হাত দেখব, না আপনার কথা শুনব ? কোনটা চান বলুন।”

খয়েরলাল দারোগাবাবুর দিকে চোখ টিপে ইঙ্গিত করে বলল, “না, না, সাধুবাবা, আপনি ঐ মেয়েটির হাতটাই আগে দেখে দিন।”

সাধুবাবা ইরানির হাত দেখার আগে তার মুখখানি একদৃষ্টিতে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর হাতের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, “তোমার ভাই হারিয়ে গেছে। তুমি পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাকে খুঁজবে, এই তো স্বাভাবিক। তুমি আমার কাছে এসেছ কেন, মা ?”

(ক্রমশঃ)



নিরালম্ববাবা ও আনন্দবাবু

প্রবীর ঘোষ



বাবার হিসেব না মেলায় পিংকি বেশ মজাই পেয়েছে। যুক্তি দিয়ে বোঝাও তো যে, এটা অলৌকিক ঘটনা নয়? মায়ের ওপর পিংকির টানটা চিরকালই একটু বেশি। তাই, মায়ের জয়ে সে খুব খুশি।

চাঁদের মতো নরম আলোয় ভেসে যাওয়া হলঘরটায় শেষপ্রান্তে নিরালম্ববাবা শূন্যে ভেসে রয়েছেন। ধ্যান করছেন পদ্মাসনে বসে। রোগা পাকানো চেহারা, মাথায় একরাশ জটা, গায়ের রঙ তামাটে, পরনে লাল টকটকে আলখাল্লা, কপালে একটা লাল কাপড়ের টুকরো বাঁধা। গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষের ছড়াছড়ি। যেখানে তিনি ভেসে রয়েছেন, তার ঠিক নীচে মেঝেতে পাতা রয়েছে বাঘছালের আসন।

এই সবে নিরালম্ববাবার ধ্যানঘরের দরজা খুলেছে।

ধ্যানঘরে ঢোকার সময় প্রবেশ-দরজার দু'পাশে দু'টো ঝোলানো বোর্ড চোখে পড়েছে। তাতে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা—ঘরে প্রবেশ করার পর মৌন অবলম্বন করুন, আপনার দর্শন শেষ হলে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান ও পরবর্তী ভক্ত-দর্শনার্থীদের দর্শনলাভের সুযোগ দিন।

একটা সুন্দর ধূপের গন্ধ সারা ঘরে ভেসে বেড়াচ্ছে। কেমন একটা পবিত্র পূজো-পূজো ভাব প্রীতি দেবীর সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। পিংকির ইস্কুলের পূজোর ছুটিকে উপলক্ষ করে দেওঘরে বেড়াতে এসে এমন একটা অসাধারণ অলৌকিক ঘটনা দেখার সৌভাগ্য হবে, এমনটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি।

প্রীতি দেবী হলেন পিংকির মা। বয়েস কবেই তিরিশ

পেরিয়েছে, তবে যোগব্যায়ামের কল্যাণে দেখায় অনেক কম। প্রতিদিন পাক্সা এক ঘণ্টা ধরে যোগব্যায়াম করেন, আর আধঘণ্টা ধরে পূজো। চাকরি না করলেও যথেষ্ট ব্যস্ত মহিলা। রেডিওতে গান করেন, বাড়িতে গান শেখান, মাঝে-মাঝে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও করেন।

পিংকির বাবা আনন্দবাবু পেশায় ব্যাঙ্ক-চাকুরে হলেও নেশাটা তাঁর লেখার। এর বাইরে আর-একটি নেশা আছে—সত্যানুসন্ধান। পত্র-পত্রিকায় কোনো অলৌকিক ঘটনার কথা প্রকাশিত হলে আনন্দবাবু সত্যানুসন্ধান নেমে পড়েন।

পিংকি হল আনন্দবাবু ও প্রীতি দেবীর একমাত্র ছেলে। মায়ের মতোই লম্বার ধাত পেয়েছে। বয়েস দশ হলেও মাথাটা পাঁচ ফুট ছুঁই-ছুঁই করছে। পড়ে সেন্ট মেরিজ স্কুলে ক্লাস ফোরে। লেখা-পড়া ছাড়া সব কিছুতেই অতি উৎসাহী। ওর মাথায় দুটি জিনিস খেলে ভাল। গল্পের প্লট ও দুটু বুদ্ধি।

নিরালম্ববাবার খবরটা দিয়েছিলেন দি গ্রেট দেওঘর হোটেলের ম্যানেজার গোবিন্দ মিত্র। কাল রাতে আনন্দবাবুদের খাবার টেবিলের সামনে এসে বিনয়ের সঙ্গে একগাল হেসে বললেন, “কয়েক দিন আছেন তো?”

আনন্দবাবু মুরগির ঠ্যাঙে কামড় বসাতে বসাতে জবাব দিয়েছিলেন “দাঁড়ান মশাই, আজই তো সবে এলুম। দেখি জায়গাটা কেমন লাগে। ভাল না লাগলে পরশুই গিরিডি চলে যাব।”

“যদি কালকের দিনটাই শুধু থাকেন, তবে বলব, কাল সন্ধ্যার সময় নিরালম্ববাবুকে একবার দর্শন করে আসুন। কলির দেবতা মশাই। সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে করতে মেঝে থেকে অন্তত আড়াই ফুট উঁচুতে উঠে পড়েন।”

“আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?” আনন্দবাবুর চোখে

কৌতুক।

“হ্যাঁ মশাই, নিজের চোখে দেখেছি। ছ’মাস হল উনি এখানে এসেছেন, তার মধ্যে ছ’বার অন্তত দেখেছি। আর, প্রতিদিনই শয়ে-শয়ে লোক দেখছেন। কত জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, মিনিস্টার আসছেন। কাল গেলে নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।”

প্রীতি দেবী তাঁর অতি প্রিয় ইলিশমাছের টুকরোর স্বাদ নিতে ভুলে গিয়ে অবাক চোখে গোবিন্দবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর কথাগুলো গিলছিলেন। এবার মুখ খুললেন, “এ-যুগেও এমন সন্ন্যাসীর দেখা পাওয়া যায়?”

গোবিন্দ মিত্র অতি বিনয়ে কিছুটা ঝুঁকে একগাল হেসে বলেছিলেন, “পাওয়া যাবে না কেন, এ-যুগেও অনেক সিদ্ধপুরুষ আছেন বই কী। তবে নকলের ভিড়ে আসল ঝুঁজে পাওয়া মুশকিল।”

রহস্যের গন্ধ পেয়ে পিংকিরও খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবার চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল। “চলো না বাবা, কাল সন্ধ্যাবেলা আমরা নিরালম্ববাবুকে দেখে আসি।”

আনন্দবাবু বললেন, “বেশ তো, তাই হবে।” তারপর গোবিন্দবাবুকে বললেন, “তাহলে কাল সন্ধ্যায় আমরা নিরালম্ববাবুকে দর্শন করতে যাচ্ছি। কাইগুলি রিকশা বা টাক্সি ঠিক করে রাখবেন।”

রাতে বাবার পাশে শুয়ে পিংকি জিজ্ঞেস করল, “নিরালম্ববাবা শূন্য ভেসে থাকেন কী করে?”

প্রীতিদেবী ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। পিংকির কথায় ঝংকার দিয়ে উঠলেন, “হ্যাঁ, তোর বাবা তো সবজাস্তা, তাই শূন্য ভাসার টেকনিকটাও ওঁর জানা।”

স্ত্রীর কথায় আনন্দবাবু হাসলেন, কোনো জবাব দিলেন না। পিংকিকে বললেন, “ম্যাজিক শো’তে স্টেজ থেকে মোটর অদৃশ্য করে হাতি নিয়ে আসার খেলা তো দেখেছিস, অথবা শূন্য চেয়ার-টেবিল বা মানুষকে ভাসিয়ে রাখার খেলা? এই সবই যে-পদ্ধতিতে সাধারণত দেখানো হয় তাকে বলে ব্ল্যাক-আর্ট।”

“তুমি ব্ল্যাক-আর্ট জানো? আমাকেও ভাসিয়ে রাখতে পারবে?” পিংকি উত্তেজনায় টগবগ করে ওঠে।

“ওসব মোটেই কঠিন নয়। শিখিয়ে দিলে দেখবি কত সোজা।”

“আমার জন্মদিনে বন্ধুদের একটা ব্ল্যাক-আর্টের খেলা দেখাবে? দারুণ মজা হবে।”

“বেশ তো, তাই হবে। তোকেই শূন্য ভাসিয়ে রাখব।”

“বাবা, আমাকে ব্ল্যাক-আর্টের খেলাটা শেখাবে?”

আনন্দবাবু পিংকির দিকে পাশ ফিরে শুয়ে শুরু করলেন, “ব্ল্যাক-আর্ট আবিষ্কার করেছিলেন ম্যাক্স আউজিস্কার নামের এক জার্মান ভদ্রলোক। তিনি ছিলেন থিয়েটারের পরিচালক। একবার তিনি একটা নতুন নাটক স্টেজে নামিয়েছেন। সেদিন ছিল অভিনয়ের প্রথম রজনী। নাটকে একটা দৃশ্য ছিল, বাবা তাঁর অবাধ্য মেয়েকে একটা প্রায় অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখবেন, এবং একটি নিগ্রো ক্রীতদাস সেখান থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করবে।

“দৃশ্যটিকে ভয়ঙ্কর করে তুলবার জন্য পরিচালক ম্যাক্স



সেই বন্দি নায়িকার চারপাশের দেওয়াল কালো পর্দায় ঢেকে দিয়েছিলেন। মেয়েটিকে উদ্ধার করতে ওপরের ছোট্ট একটা জানলা দিয়ে নেমে এল কুচকুচে কালো সেই নিগ্রো ক্রীতদাস।

“নায়িকার এমন নাটকীয় মুক্তিক্ষণে দর্শকদের উত্তেজনা ও হাততালিতে ফেটে পড়ার কথা। কিন্তু কই, দর্শকদের মধ্যে ঘটনার প্রতিফলন তো নেই! কেন এমনটা হল, বুঝতে ম্যাস্ট্র দ্রুত নেমে এলেন দর্শকদের কাছে। মঞ্চের দিকে তাকাতেই কারণটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। মঞ্চের স্বল্প আলোয় কালো নিগ্রো ক্রীতদাস কালো মখমলের পর্দার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, ওকে দেখাই যাচ্ছে না। সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাস্ট্র বুঝতে পারলেন যে, কম আলোয় গাঢ় রঙের পর্দা টাঙিয়ে সেই ধরনের গাঢ় রঙের যে-কোনো জিনিস পর্দার সামনে রাখলে জিনিসটা দর্শকদের চোখে পড়বে না, অর্থাৎ অদৃশ্য হয়ে যাবে।”

নিরালম্বাবার শূন্য ভেসে থাকাটা যে ব্ল্যাক-আর্ট ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং তাঁর কারচুপিটা কাল যখন কয়েক শো ভক্তের চোখের সামনে ফাঁস হয়ে যাবে, তখন তাঁর অবস্থাটা কেমন হবে ভাবতেই পিংকি আনন্দে বিছানাতেই বার কয়েক লাফিয়ে নিল। তারপর, একটু ভয়-ভয় গলায় বলল, “নিরালম্বাবার দলবল তোমাকে আবার মারধোর করবে না তো?”

বাবার বদলে মা’ই উত্তর দিলেন। “ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গেলে মারধোর খাওয়াই উচিত। যন্ত সব! আগের থেকেই উনি ধরে বসে রইলেন নিরালম্বাবা ধান্নাবাজ।”

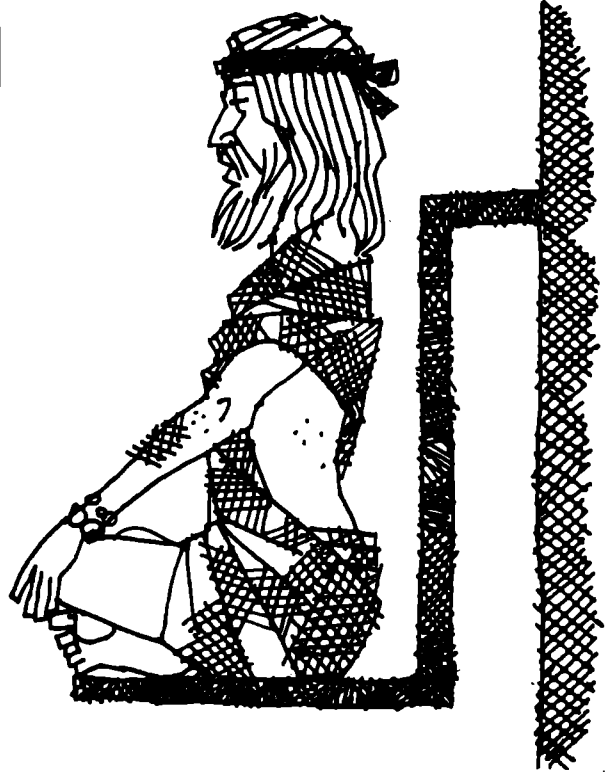
আনন্দবাবু গলা নামিয়ে বললেন, “পিংকি, ঘরের তাপ বাড়ছে। আর নয়, তুই এবার ঘুমোবার চেষ্টা কর।”

উত্তাপ যে বাড়ছে সেটা বুঝে নিয়ে চুপচাপ চোখ বুজল পিংকি।

আজকে এই মুহূর্তে নিরালম্বাবাকে দেখে পিংকির বুঝতে অসুবিধে হল না যে, তাঁর এই শূন্য ভেসে থাকার পিছনে ব্ল্যাক-আর্টের কোনো খেলা নেই। তাঁর ফুটখানেক পিছনেই রয়েছে নেহাত একটা সাধারণ সাদা চুনকাম করা দেওয়াল, ফুট-ছয়ক তফাত থেকে দেখলেও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানোর মতো কোনো রঙের খেলা এর মধ্যে নেই। তবে?

এই তবোটার উত্তর খুঁজছিলেন আনন্দবাবুও। নিরালম্বাবার অলৌকিক ক্ষমতার কাছে সব যুক্তিই কি হেরে যাবে? এও তো দেখেছেন যে, ডঃ প্রদীপ সেনের মতো ঘোর নাস্তিক, বিজ্ঞানের অধ্যাপকও এক সাধুবাবার অলৌকিক ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে, নিজের বুদ্ধিতে সাধুবাবার কাজের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে, শেষপর্যন্ত তাঁরই সবচেয়ে বড় ভক্ত ও প্রচারক হয়ে উঠেছেন। নিজের বেলাতেও এমনটাই ঘটবে না তো?

আনন্দবাবুর কপালের দু’পাশটা টিপটিপ করতে শুরু করল। আর কী কী কৌশলে ভেসে থাকা সম্ভব? দু’হাতে কপালের দু’পাশটা টিপে ধরে ভাবতে থাকেন আনন্দবাবু। প্রীতি দেবীর সেদিকে নজর নেই। নজর শুধু নিরালম্বাবার দিকে। তাঁর মনে হল, এমন মহাপুরুষের সামনে নীরবে কয়েক মুহূর্ত কাটানোও যেন মস্ত পুণ্যের কাজ।



সবাইকে হতচকিত করে দিয়ে আনন্দবাবু হঠাৎই গৌ-গৌ আওয়াজ করে টালমাটাল পায়ে দ্রুত দু-তিন পা এগিয়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতে লাগলেন নিরালম্বাবার গায়ের ওপর। শক্তসমর্থ এক শিষ্য তখনই চিতাবাঘের ক্ষিপ্ততায় দৌড়ে এল আনন্দবাবুকে ধরে ফেলতে।

কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। আনন্দবাবু হুড়মুড় করে আছড়ে পড়লেন নিরালম্বাবার গায়ে। নিরালম্বাবাকে নিয়েই মাটি নিলেন আনন্দবাবু।

নিরালম্বাবা যেখানে ভেসে ছিলেন, সেখানে এই মুহূর্তে এক অদ্ভুত দৃশ্য বিরাজ করছে। দেওয়াল থেকে ঝোলানো রয়েছে একটা লম্বা ও বাঁকানো লোহার বসার সিট, নিরালম্বাবার ভেসে থাকার অবলম্বন এতক্ষণ এই লোহার সিটটা বাবাজির শরীরের আড়ালে ছিল অদৃশ্য। বোঝার সুবিধের জন্য উপরে একটা ছবি দেওয়া হল।

মুহূর্তে ঘরের পরিবেশটা গেল বদলে। পিংকি সবিস্ময়ে দেখল একটু আগের সেই ভক্তরাই আন্তিন গুটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন নিরালম্বাবা ও তাঁর চেলাদের দিকে। আর আনন্দবাবুই সেই ক্রুদ্ধ জনতাকে থামবার চেষ্টা করছেন। পিংকির আর বুঝতে অসুবিধে হল না যে, বাবার মুর্ছা যাওয়াটা আর কিছুই নয়, অভিনয়। আসলে সত্যানুসন্ধানের জন্যই তিনি অভিনয় করে যাচ্ছিলেন।

সেই রাত্তিরে হোটেল ফিরে যখন ব্যাপারটা নিয়ে গল্প চলছে, তখন প্রীতি দেবী বললেন, “নিরালম্বাবা ভণ্ড হতে পারেন, কিন্তু তাই বলে যেন সবাইকে ভণ্ড ভেবো না।”

বাবা বললেন, “তা কেন ভাবব। আসলে ধর্মের নামে মানুষকে যারা ভেঙ্কি দেখিয়ে বেড়ায়, তাদেরই আমি সন্দেহ করি। যারা সত্যিকারের সাধক, তাঁরা কখনও এইভাবে লোক জমিয়ে ভেঙ্কি দেখান না।”

ছবি : দেবাশিস দেব

সুস্বাস্থ্যের জন্য আসল আয়ুর্বেদিক টনিক এখন নতুন সাজে

বৈদ্যনাথ

চ্যবনপ্রাশ

শক্তি আর পুষ্টি দিতে ৪ ভাবে সমৃদ্ধ

১ ৪৮টি প্রয়োজনীয় এবং অবিষাক্ত গাছ-গাছড়া ও উপাদান দিয়ে তৈরি বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ প্রকৃতির নিজস্ব উপায়ে বছরভোর আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে।

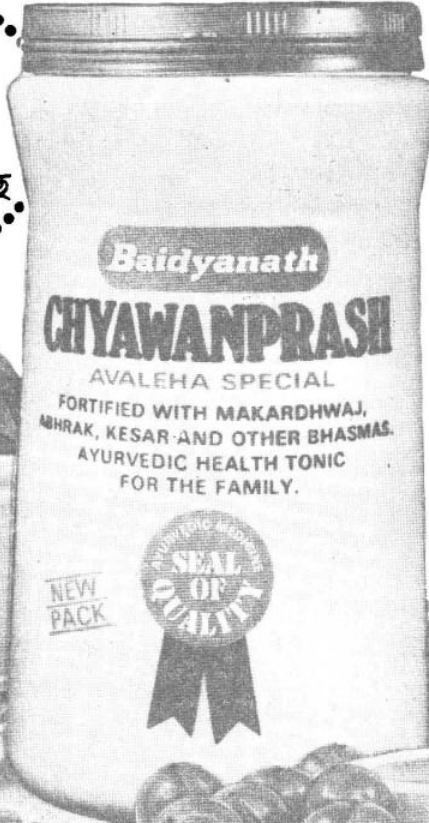
২ সর্দি-কাশি এবং শারীরিক দুর্বলতার মহৌষধ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ। কারণ, একমাত্র এই

চ্যবনপ্রাশেই আছে ৪টি বিশেষ উপাদান— মকরধুজ, অবরকভক্ষ, শৃংভক্ষ এবং কেসর।

৩ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ যোগায়। অন্যান্য টনিকের মতো রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি নয় বলে এই ভিটামিন ও খনিজ সহজেই শরীরে মিশে যায়।

৪ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ পরিবারের প্রত্যেকের পক্ষেই উপকারী। বড়দের জন্য প্রতিদিন দু'বার এক চামচ করে চ্যবনপ্রাশ সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে, পুষ্টি যোগায় এবং দৃষ্টিচলতা ও দুর্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা করে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন দু'বার এক চামচ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ শীতের নানান রোগ বালাই ঠেকিয়ে রাখে।

এখন
আধুনিক
আকর্ষণীয়
পলিপাকে
পাওয়া যাচ্ছে



বৈদ্যনাথ

৫টি আধুনিক কারখানায় ৭০০-রও বেশি আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি করে

শ্রী বৈদ্যনাথ
আয়ুর্বেদ ভবন লি:

কমলালেবুর পাঁচটি বীজ সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : জন ওপনশয়ের কাকার কাছে রহস্যময় চিঠি আসে। খামের ভিতর থেকে ঝরে পড়ে কমলালেবুর পাঁচটি বীজ। কাকার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যু হয় ওপনশয়ের বাবারও। এবারে চিঠি পেয়েছে ওপনশ। খামের ভিতরে সেই পাঁচটি বীজ। KKK বলতে কাদের বোঝায়? শার্লক হোমসের অনুরোধে ওয়াটসন তাকে এনে দিয়েছে বিশ্বকোষ। তারপর...

॥ ৪ ॥



বইটা হাতে নিয়ে শার্লক হোমস বললে, “ধন্যবাদ। কিন্তু এটা দেখবার আগে এসো চেষ্টা করা যাক আমরা যতটুকু জেনেছি তার থেকে কী সিদ্ধান্ত করতে পারি। প্রথমে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জন ওপনশয়ের কাকার আমেরিকা থেকে চলে আসবার পিছনে বিশেষ কোনো কারণ ছিল। কেননা, যে বয়েসে তিনি

আমেরিকা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে আসেন, সেই বয়েসের লোকেরা সাধারণত নিজেদের চেনা পরিবেশ ছেড়ে চট করে অন্য কোথাও যেতে চায় না। বিশেষ করে ফ্লোরিডার চমৎকার আবহাওয়া ছেড়ে ইংল্যান্ডের ঠাণ্ডায় পাড়াগাঁয়ে কেউই বিনা কারণে আসতে চাইবে না। তিনি যে লোকজনের সম্পর্ক বাঁচিয়ে একলা-একলা থাকতে চাইতেন তার থেকে এটাই মনে হয় যে, তিনি কোনো কিছু বা কোনো লোকের ভয়ে অমন করে লুকিয়ে থাকতেন। তার থেকে এ-অনুমান করাও ভুল হবে না যে, কোনো কিছু বা কোনো লোকের ভয়েই আমেরিকা থেকে পালিয়ে আসতে তিনি বাধ্য হন। এখন কার বা কিসের ভয়ে তিনি আমেরিকা থেকে পালিয়ে আসেন তার কিছুটা হদিস আমরা পেতে পারি তাঁকে ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে লেখা চিঠিগুলো পরীক্ষা করে। তুমি ওই চিঠিগুলোয় ডাকঘরের ছাপ লক্ষ্য করেছিলে কি?”

“হ্যাঁ। প্রথম চিঠিটা ফেলা হয়েছিল পণ্ডিচেরিতে, দ্বিতীয় চিঠিটা ফেলা হয়েছিল ডানডিতে আর তৃতীয়টা ফেলা হয়েছে লণ্ডনের পুর্বদিকের কোনো ডাকঘরে।”

“লণ্ডনের পুর্বদিকের কোনো ডাকঘরে।...হুঁ...আচ্ছা, এর থেকে তুমি কোনো সিদ্ধান্ত করতে পারো কি?”

“তিনটে জায়গাই সামুদ্রিক বন্দর। অর্থাৎ ঐ পত্র যে লিখেছে, সে কোনো জাহাজযাত্রী।”

“এটা তুমি দারুণ বলেছ ওয়াটসন। এখন আমাদের হাতে একটা কাজের উপযুক্ত সূত্র পাওয়া গেল। এ-বিষয়ে আমরা মোটামুটি নিঃসন্দেহ যে, পত্রলেখক খুব সম্ভবত... না, না, সম্ভবত নয়, প্রায় নিশ্চিত ভাবেই কোনো জাহাজের যাত্রী। আচ্ছা, এবার আর-একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাক। প্রথম চিঠির বেলায়, যেটা পণ্ডিচেরিতে ফেলা হয়েছিল, হুমকি দেবার প্রায় সাত সপ্তাহ পরে চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী কাজ হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় চিঠিটা যেটা ডানডিতে ফেলা হয়েছিল সেটার বেলায় চিঠি পৌঁছবার তিন-চার দিনের মধ্যেই চিঠির কথা অনুযায়ী কাজ হয়েছিল। এর থেকে তুমি কিছু আন্দাজ

করতে পারছ কি?”

“মনে হয় পত্রলেখককে বহুদূর থেকে আসতে হয়েছে।”

“কিন্তু চিঠিটাও তো অনেক দূর থেকে এসেছে, তাই নয় কি?”

“নাহ্, তাহলে আমার বুদ্ধিতে কুলোল না।”

“এইরকম একটা আন্দাজ মোটামুটি ভাবে করা যায় যে, পত্রলেখক বা লেখকেরা যে জাহাজের যাত্রী সেটা হচ্ছে পালতোলা জাহাজ। মনে হয় যে, এরা এদের কাজে নামবার ঠিক আগেই তাদের চিঠি বা সংকেত যে-ব্যক্তিতাদের লক্ষ্য, তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, ডানডি থেকে চিঠি পাঠাবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জনের বাবার আশ্চর্যভাবে মৃত্যু ঘটল। যদি তারা পণ্ডিচেরি থেকে স্টিমারে আসত, তাহলে তারা আর তাদের চিঠি একই সঙ্গে পৌঁছে যেত। কিন্তু তা হয়নি। চিঠি আসবার আর জনের কাকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে সাত সপ্তাহ কেটে গেছে। আমার দৃঢ় ধারণা এই সাত সপ্তাহ দেরি হবার কারণ হল ডাকবাহী স্টিমার যাত্রীবাহী পালতোলা জাহাজের চেয়ে সাত সপ্তাহ আগে ইংল্যান্ডে পৌঁছে গিয়েছিল।”

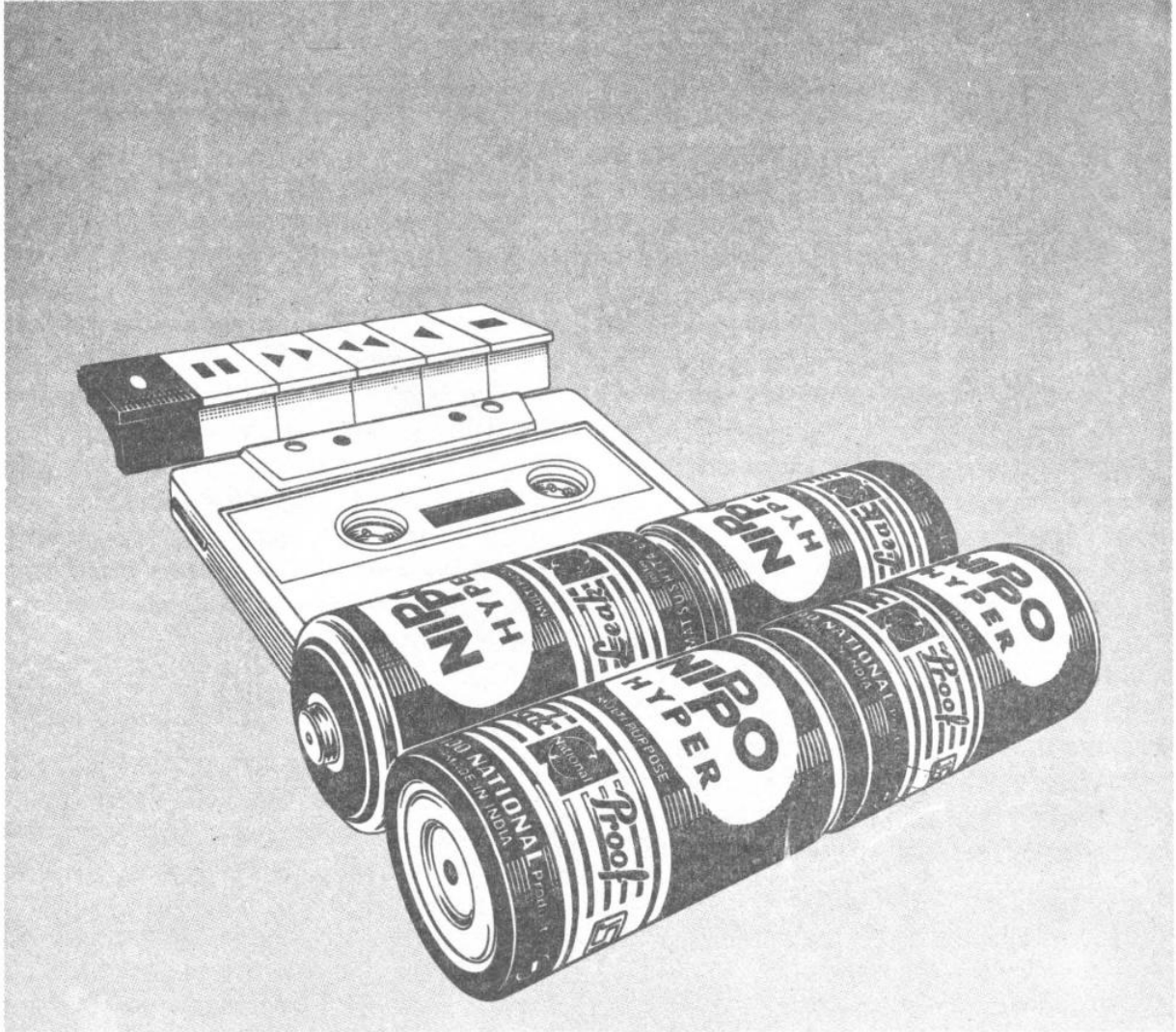
“হ্যাঁ, সেটা হতে পারে।”

“না, এটা হতে পারে নয়, এটাই হওয়া সম্ভব। তাহলেই তুমি বুঝতে পারছ যে, কেন আমি ছেলেটিকে এতবার এত বেশি করে সাবধান হতে বলছি। এই রহস্যের ঠিকমতো সমাধান করতে হলে সব কাজই আমাদের খুব সাবধানে অথচ যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, চিঠি পাবার পরে পত্রলেখকের ঘটনাস্থলে হাজির হতে যতটুকু সময় লেগেছে ঠিক তার পরেই যাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখা হয়েছে তার ওপর চরম আঘাত নেমে এসেছে। জনকে লেখা চিঠিটা এসেছে লণ্ডন থেকে সুতরাং আর যাই হোক এ-ক্ষেত্রে চিঠির হুমকি অনুযায়ী কাজ হতে যে দেরি হবে না সেটা আমরা ধরে নিতে পারি। তাই আমাদের যা-কিছু করবার তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে ফেলতেই হবে।”

“ওপনশদের এই ধরনের কঠিন শাস্তি দেবার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে বলে তোমার ধারণা?”

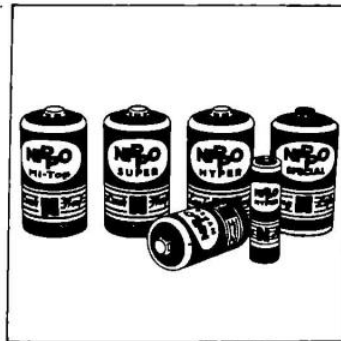
“জনের কাকার কাছে যে কাগজপত্র ছিল সেগুলো ওই জাহাজের কোনো যাত্রী বা যাত্রীদের কাছে ভীষণ দরকারি। আমি নিশ্চিত যে, এর পেছনে কোনো বিশেষ একটি লোক নেই। আছে গোটা একটি দল। কেননা করোনাকে ঠকিয়ে দু-দুটো খুনকে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বলে চালানো কোনো একজন লোকের পক্ষে অসম্ভব। এদের দলে অনেক লোক আছে। এরা অসম্ভব নাছোড়বান্দা আর এদের টাকাপয়সা ছাড়াও

আপনার ব্যাটারির খোপে ভরে দেওয়া দরকারী জাপানের সবর সেবা কারিগরী ভরে দ্বি নিপ্পো



খাস জাপানের নামজাদা "ন্যাশনাল" মানেই বিশ্বের পরমা নম্বর কারিগরী, তারাই বানায় নিপ্পো ব্যাটারি। আপনার কেনবার পক্ষে সবকিছতে নির্ভরযোগ্য গুণাই সেল হল এগুলিই— আপনি নিশ্চয় আপনার নামী দামী সরঞ্জামগুলিতে যে কোন অন্য ব্যাটারি ব্যবহার করতে ভরসাই পাবেন না ?

- উপরে সীলবদ্ধ থাকাই গ্যারান্টি দেয় এ ব্যাটারি থেকে সমা বেরনো টাটকা শক্তি
- আই এস আই মার্ক। আপনাকে সেস সেবা গুণমানের প্রতিশ্রুতি
- খাতু দিলে মোড়া বলে লোক করার ভয় থেকে পরোপূর্ণি সুরক্ষা
- প্রত্যেকটি ব্যাটারি আপনার হাতে পৌছয় খুটিয়ে পরীক্ষার পর নির্ভরযোগ্য শক্তির সম্পূর্ণ সম্ভার
- নিপ্পো হাই-টপ ● নিপ্পো সুপার
- নিপ্পো হাইপার ● নিপ্পো স্পেশাল
- নিপ্পো পেনলাইট



নিপ্পো

ব্যাটারি
টেকনিক যার খাস
জাপানের ত্যাশনাল হতে
আর এর শক্তিশালী ব্যাটারি
তৈরি হয় ভারতে

সবরকম সুযোগ-সুবিধেও আছে। সেইজন্যে যে-কোনো ভাবেই তারা এইসব কাগজপত্র ফিরে পেতে দৃঢ়সংকল্প। সে কাগজ যার কাছেই থাকুক তাকেই তারা তাড়া করবে শিকারি কুকুরের মতো। তাহলে এখন বুঝলে K K K কোনো ব্যক্তির নামের আদ্যক্ষর নয়, এটা একটা দলের প্রতীক বা চিহ্ন।”

“কিন্তু এটা কাদের দল?”

শার্লক হোমস আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে আশ্চর্য হয়ে বললে, “সে কী! তুমি কি Ku Klux Klan-এর নাম শোনোনি?”

“না তো?”

আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে হোমস তার কোলের ওপর রাখা বইটি খুলে পাতা ওলটাতে লাগল। তারপর একটা পাতা খুলে চোখ বুলোতে বুলোতে বলল, “এই যে পেয়েছি। Ku Klux Klan। রাইফেলে গুলি পুরতে যে-রকম শব্দ হয় সেই আওয়াজের সঙ্গে মিলিয়ে এই দলের নাম দেওয়া হয়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পরে দক্ষিণ র জ্যাগুলির ছাঁটাই হওয়া সৈন্যরা মিলে এই সাংঘাতিক গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা করে। আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গুপ্তসমিতির শাখা স্থাপিত হয়। টেনেসি, লুইসিয়ানা, ক্যারোলিনা, জর্জিয়া আর ফ্লোরিডায় এদের শাখাগুলো খুবই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সাধারণভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতালোভের উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিবিশেষ এদের কাজে লাগাত। এদের কাজ ছিল মোটামুটি দু’রকমের। এক, নিগ্রো ভোটদাতাদের ওপর অত্যাচার করে তাদের ভয় দেখানো আর দ্বিতীয় কাজ হল তাদের সঙ্গে যাদের মতের মিল হত না তাদের একেবারে শেষ করে দেওয়া। এদের এই ধরনের জঘন্য কার্যকলাপ মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হত। যে লোককে এরা এদের শত্রু বলে মনে করত তাকে প্রথমে একটা হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠাত। সেই চিঠির সঙ্গে থাকত হয় ওকগাছের পাতা নাহয় তো তরমুজ বা কমলালেবুর বীজ। এই হুমকি-দেওয়া-চিঠি যাকে দেওয়া হত হয় সে চিঠির শর্ত অনুযায়ী কাজ করত, নাহয় দেশ ছেড়ে পালাত। আর যারা ওদের হুমকি অগ্রাহ্য করেছে তাদের প্রত্যেকেরই আকস্মিক ও অদ্ভুতভাবে মৃত্যু ঘটেছে। এদের এই সমিতির কাজকর্ম এমনই নিখুঁত আর গোছানো যে, আজ পর্যন্ত এরা যাদেরই চিঠি পাঠিয়েছে তাদের একজনও এদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এইভাবে এরা এতদিন যে একটার পর একটা অন্যায্য কাজ করে গেছে সেজন্যে এদের দলের কোনো লোককে ধরতে পারা তো দূরে থাক, এদের একজনেরও আসল পরিচয় পুলিশ পায়নি। বেশ কিছুকাল মার্কিন সরকারের সমস্ত রকম চেষ্টাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই গুপ্তঘাতক সমিতি তাদের অত্যাচার বেশ জোরদারভাবে চালিয়ে এসেছে। এদের দাপট খুব বেশি ছিল দক্ষিণ দিকের প্রদেশগুলিতে। তারপর হঠাৎ ’৬৯ সালে প্রায় রাতারাতি এই সমিতির কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে গেল। এরপরে অবশ্য কখনও-কখনও ছুটকো-ছটকাভাবে এদের কুকর্মের খবর পাওয়া গেছে।”

বইটা তুলে রাখতে-রাখতে হোমস বললে, “তুমি যদি একটু খুঁটিয়ে দ্যাখোতো লক্ষ্য করবে যে, এই সমিতির উঠে যাওয়ার সঙ্গে ওপনশয়ের কাকার আমেরিকা থেকে কাগজপত্র নিয়ে পালিয়ে আসার একটা সময়ের দিক থেকে যোগাযোগ আছে।



এমন হতে পারে যে, জনের কাকা আমেরিকা থেকে পালিয়ে এলেন বলেই ওই সমিতি উঠে গেল। সেই কারণেই ওই সমিতির লোকেরা বুন্দো কুকুরের মতো হনো হয়ে লেগে আছে ওপনশ বংশের পেছনে। এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, জনের কাকা যে ডায়েরি নিয়ে পালিয়ে আসেন তাতে এই সমিতির অনেক সদস্যের ব্যক্তিগত পরিচয় ছাড়াও বহু গোপন খবর লেখা ছিল। সুতরাং সেই ডায়েরিটা উদ্ধার করতে না পারা পর্যন্ত এদের ঘুম হবে না।”

“তাহলে ডায়েরির যে ছেঁড়া পাতাটা আমরা দেখেছি—”

“তুমি যা অনুমান করেছ ঠিক তাই। আমার যতদূর মনে পড়ছে তাতে এইরকম লেখা ছিল: ‘ক’ ‘খ’ ‘গ’-কে কমলালেবুর বীজ ছাড়া হল। এর মানে হল যে, এদের সাবধান করে দেওয়া হল। তারপর লেখা ছিল ‘ক’ আর ‘খ’ পরিষ্কার হয়ে গেছে। এর মানে এরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। আর ‘গ’ সম্বন্ধে লেখা ছিল গয়ের সঙ্গে মোলাকাত করা গেল। এই কথাটার মানে কিন্তু ভাল নয়। ‘মোলাকাত করা গেল’ কথাটার মানে হল ‘গ’-কে খুন করা হল। ডাক্তার, মনে হচ্ছে যে এতদিনে হয়তো Ku Klux Klan রহস্যের সমাধান হবে। তবে জনওপনশয়ের বাঁচবার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে আমি তাকে যা করতে বলেছি সেইমতো কাজ করা। যাই হোক, আজ রাতে এ-ব্যাপারে আর কোনো আলোচনা করে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং আমার বেহালাটা দাও, সংগীতচর্চা করা যাক। তাহলে যদি এই বিব্রী আবহাওয়া আর মানুষের কুৎসিত আচার-ব্যবহারের কথা অন্তত কিছুক্ষণ ভুলে থাকা যায়।”

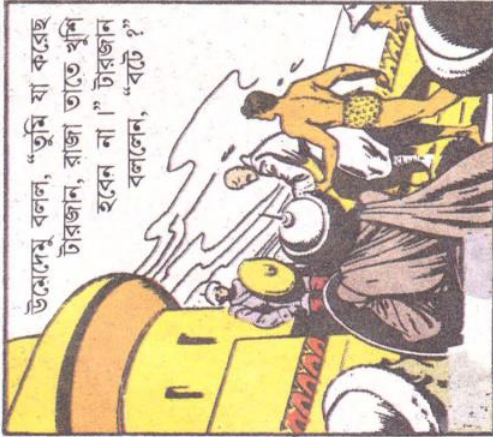
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন



টারজান

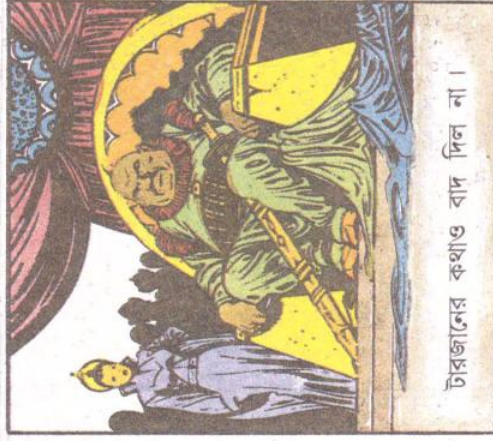
এডগার রাইস বারোজ



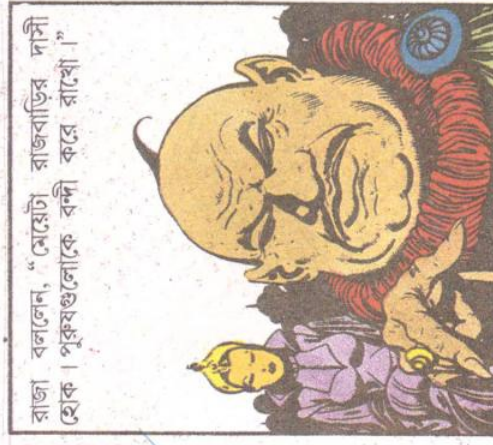
উমেদেমু বলল, “তুমি যা করেছ
টারজান, রাজা তাতে খুশি
হবেন না।” টারজান
বললেন, “বটে?”



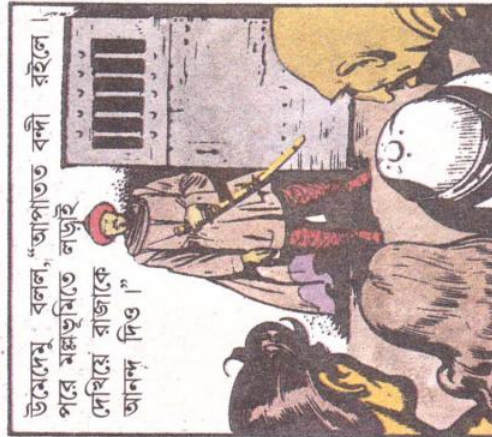
রাজাকে উমেদেমু
সব কথা জানাল...



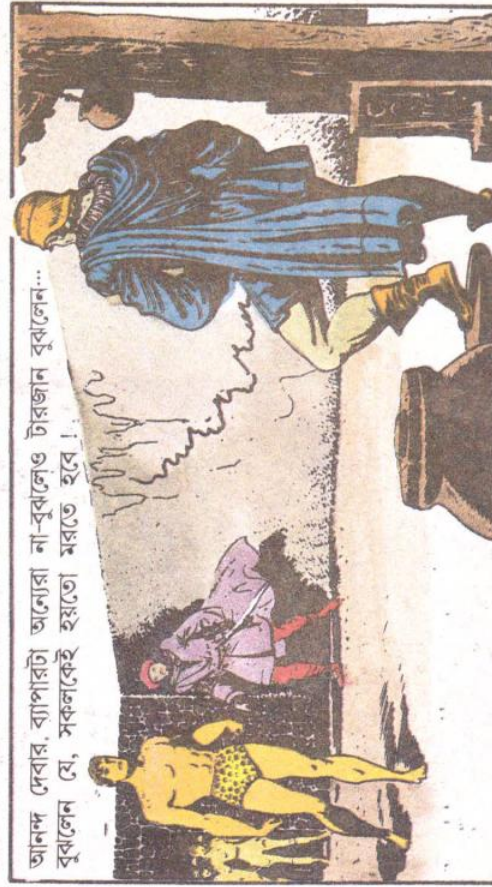
টারজানের কথাও বাদ দিল না।



রাজা বললেন, “মেয়েটা রাজবাড়ির দাসী
হোক। পুরুষগুলোকে বন্দী করে রাখো।”



উমেদেমু বলল, “আপাতত বন্দী রইলে।
পরে মল্লভূমিতে লড়াই
দেখিয়ে রাজাকে
আনন্দ দিও।”



আনন্দ দেবার ব্যাপারটা অনেরা না-বুঝলেও টারজান বুঝলেন...
বুঝলেন যে, সকলকেই হয়তো মরতে হবে!



ফাঁটকে বন্দী একটি লোক তুচ্ছ ভাসিতে
তাদের দেখল...

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



বানভাসি

লীলা মজুমদার

সাতটা ছেলেমেয়ে সাত রকমের। তবে এক বিষয়ে সব সমান। পাড়ার লোকে তাই বলে। নোনতা, তিতুকুটি, বোঁচা, চটা, কটা, সোনা, পিয়া সবাই মহা তাঁদড়; বিশেষ করে মেয়ে দুটো। সবাই বলে তারাই হল পালের গোদা; যত বদবুদ্ধি তাদের মাথাতেই গজায়। এদিকে দেখলে মনে হয় ভাজা মাছটি উন্টে খেতে জানে না ওই সোনা আর পিয়া। নতুন লোক গাঁয়ে এসে তাদের রূপ দেখে গলে যায়। এমন চেহারা তো গাঁয়ে-গঞ্জে চোখে পড়ে না। দু' দিন না যেতেই তাদেরও চোখ ফুটে যায়। দুরন্তের শিরোমণি; এমন অলঙ্ঘী ভূ-ভারতে আর নেই। আবার কেমন যেন অন্যরকম, আর পাঁচজন থেকে আলাদা।

অষ্টপ্রহর সাতটাতে খালি খাই খাই করে বেড়ায়। তা এই গরিবদের গাঁয়ে অত ভাত কে যোগাবে শুনি? রোজ সন্ধ্যায় ছেলেগুলোকে গরু-খোঁজা করে ধরে এনে, ছোট পণ্ডিতের খিটখিটে বউ পাঠশালার চাতালে চাটাই পেতে শুতে দেয়। মেয়ে দুটো ঘরেই শোয়। এর বাড়ি ওর বাড়ি খায়দায়। কাজ করে দেয় তার বদলে। পণ্ডিতের বউ গজর-গজর করে আর চোখের জল মোছে। মা-বাবার পাত্তা নেই, চালচুলো নেই। বানের জলে যেমন ঝড়তি-পড়তি কাঠকুটো ভেসে এসে

বুড়ো-নদীর বাঁকে আটকে থাকে, এরাও ঠিক তেমন ধারা। পাঁচ সাল আগে বড় বর্ষায় আকাশ ফুটো হয়ে গবগব করে জল নামাতে, ওই ভালমানুষ বুড়ো নদী, যা হাঁস-মুরগি হেঁটে পার হয়, সে-ই সবনাশা চেহারা ধরে পাঁচ কোশের মধ্যে সব ফসলনাশ করে, চাঁদ-পাহাড়ির গায়ের আধখানা বনজঙ্গলসুদূর ভেঙে নিয়ে, মহানদী সেজে, বত্রিশটে গাঁ ভাসিয়ে এদিককার দিগন্ত অবধি যত দূর দৃষ্টি চলে সমস্ত পাকা ধান ডুবিয়ে, এই ছোট পিয়াসোনা গাঁয়ের পাশ দিয়ে নতুন খাত কেটে, নতুন নদী বানিয়ে বয়ে গেছিল। পুরনো খাতটা হেজেমজে গেল।

পিয়াসোনার বেগ দু দিন পরেই কমল, হাঁটু-জল হল; তখন গ্রামের ডাকসাইটে জোয়ানরা বড় পণ্ডিতের সঙ্গে মুণ্ডেশ্বরীর বন পর্যন্ত ঠেঙিয়ে গিয়ে, জঙ্গলের ধারে মেলা মরা গোরু ছাগল মহিষ ভেড়া মানুষের মধ্যে এই সাতটে জিন্দা প্রাণীকে দেখতে পেল। মরা যারা ছিল, তাদের কতককে মাটি দিয়ে, কতককে দাহ করে, তবে সে না ঘরে ফেরা।

তখন বড় পণ্ডিত বলেছিলেন, “দেবতা এদের প্রাণ বাঁচিয়েছে, ওদের গাঁয়ে নিয়ে যা। এরাই এক দিন গাঁ বাঁচাবে। দেখছিস না নতুন নদীর বালিতে সোনার গুঁড়ো চিকচিক করছে। এদের মানুষ করার খরচাও দিয়ে দিয়েছে বোঙা। খুদে মেয়েটার নাম দিস সোনা আর তার চেয়ে একটু বড় মেয়েটার নাম দিস পিয়া। নদীর নাম পিয়াসোনা। তোরা সবাই মিলে এদের সাতজনকে পালবি। নইলে গ্রামের সর্বনাশ হবে। এই আমি বলে দিলাম। এবার আমি বোঙার খোঁজে চললাম।” এই বলে বড় পণ্ডিত সেই যে গেল, আর এল না।

দেখতে দেখতে বছরগুলো ঘুরতে লাগল। বড় পণ্ডিতের পাত্রা নেই। ব্রহ্মচারী মানুষ; তাঁর ঘরগেরস্থালি, আপনজন বলেও আলাদা কিছু ছিল না। এই গাঁটাই তাঁর ঘর; গেরস্থদের ঘরে ঘরে তাঁর গেরস্থালি। লোকে তাঁকে বড় মান্য করত। বলত, ‘ওর কথার নড়চড় হয় না। যা বলবে তা ফলবেই।’ সেই ভয়েই গাঁয়ের মধ্যে যাদের অবস্থা একটু ভাল, তাদের বাড়িতে ছেলেমেয়েগুলোকে বিলিয়ে দিল। সবাই বলল, আর পাঁচটার সঙ্গে দু’ বেলা দু-মুঠো কুলিয়ে যাবে’খন। তবে শুত সবাই ছোট পণ্ডিতের কুঁড়েঘরে। ছোট পণ্ডিতের কালোবউ কিছুতেই ছাড়ল না।

কিন্তু সব দিন কারও সমান যায় না। আট বছর পুরতে না পুরতে পিয়াসোনার চিকচিকে বালি থেকে গাঁয়ের লোকে সব সোনা হেঁকে তুলে ফেলল। দিনে দিনে জলের স্রোতও কমে এল; এখন পায়ের কবজিটুকুও ডোবে কি না-ডোবে। এমনতেই পরের ছেলে মানুষ করা বড় জ্বালা। তার ওপর তারা যদি এই সাতটার মতো মহা দুরন্ত হয়, তবে তো কথাই নেই। যারা মাঠের গোরুর দুধ অর্ধেকটা দিয়ে নিয়ে হা-ঘরেরদের খাওয়ায়, জাত-আমের গুটির কষ কমতে না কমতে নুন-লঙ্কা দিয়ে সাবাড় করে, সব পেয়ারা গাছ ন্যাড়া করে রাখে, আর, সবচেয়ে ভয়ের কথা, গাঁসুদু সব ছেলেপুলে যাদের ঠিক ঠাকুরপূজো করে, তাদের গাঁ থেকে দূর করা যায় কেমন করে? বড়দের চক্ষুশূল, ছোটদের প্রাণের প্রাণ। যা পায় সবার সঙ্গে ভাগ করে খায়; যেখানে যায়, সবটাই সঙ্গে নিয়ে যায়। খালি ছোট পণ্ডিতের উটকপালি দাঁত-উঁচু বউটা তাদের ভালবাসে। তাকেও সবাই গাল দেয়; বলে, ‘নিজের একটাও বাঁচে না, তাই পরের ছেলেমেয়ে নিয়ে বাড়াবাড়ি!’ বলে, ‘অলুক্ষুনে, ওর মুখ দেখলেও দিন ভাল যায় না।’ সাতটা ছেলে ওকে ডাকে মা বলে। একটা কাউকে মা বলে ডাক দিতে না পারলে কি মানুষের ছেলেমেয়ে বাঁচে? ওদিকে বড়রা বউয়ের ওপর মার-মুখো। গাঁয়ে বড় অশান্তি।

সবচাইতে বিরক্ত হরবিলাস। তার পাঁচটা গোলা, তাই মনে ভয়ও সবচেয়ে বেশি। সে বলল, “সাত বাড়িতে খায়, সাতটাকে সেই সাত বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দাও। উদয়াস্ত খাটালে ধানাইপানাই বেরিয়ে যাবে।” ছোট পণ্ডিতের বউ সামান্য একটু খোনা, একথা শুনে চটে লাল হয়ে সে বললে, “অঁ মা, কী বলে গো! কেঁ না জানে, গঁতর খাঁটালে নেকা-পড়া হয় না! সব কঁটা মুখ্য হয়ে থাকলে, ফিরে এসে বঁড়ঠাকুর-ই বা কী বলবেন? না, ওঁতে আমার মত নেই।” কিন্তু মত নেই তো শুনছে কেটা! ছোট পণ্ডিত বউকে ধমকে বলল, “তুমি মুখ্য মেয়েমানুষ হয়ে বড়লোকের ওপর চোপা করো না!” ছোটবউ বলল, “ওমা! চোপা কঁরলাম কঁখন? নেযা কঁথাকে বুঝি চোপা বলে!”

॥ দুই ॥

কালোবউয়ের বেআদবির কথা ঘরে ঘরে রটে গেল। মেয়ে-বউরা গালে হাত দিয়ে বলল, “ছি, ছি, কী আশ্পন্দা! কিন্তু কথটা মন্দ বলেনি কালোবউ। তা বাপু, মুখ্য হই যা-ই হই, হক্ কথাই বলব। যদি বড় পণ্ডিত সত্যি ফিরে আসে! বারো বছর অপিক্ষে না করে, কিছু করাটা ঠিক নয়।” মানুষ মা বলল, “অবিশ্যি অত চিন্তেরো কোনো কারণ দেখিনে। ওরা

কি আর একলা গতর খাটাবে ভেবেছ? আমাদের বাছারা যদি জোট বেঁধে পাঠশাল পালিয়ে হাত না লাগায় তো কী বলেছি! অবিশ্যি তার ফলও ভাল হবে না। ছোট পণ্ডিতেরই চাকরি যাবে, তখন কালোবউ কী বলে শোনা যাবে।”

কথটা মানুষ বাবার কানে যেতেই সে-ও রেগে চতুর্ভুজ! “এ-সব অলুক্ষুনে কথা মুখে এনো না বউ, পাজিতে লিখেছে আকাল হবে। খরা হবে, নদী-নালা শুকাবে।” শুনে বউয়েরও শুকনো মুখ। “আহা, অত ভয়ের কিছু নেই। বড় ঠাকুর তো বলেই গেছে, পিয়াসোনার জল কখনও শুকাবে না। তার মুখ দিয়ে যা বেরিয়েছে তা ফলবেই ফলবে।” মানুষ বাবা কাষ্ঠ হাসল, “সে তো এ-ও বলে গেছে, ঐ সাতটা শিম্পাজিই গাঁ বাঁচাবে, নইলে সর্বনাশ হবে। এদিকে তোমরা তো দিন-রাত ফন্দী করো, ওগুলোকে কী করে বিদেয় করা যায়। পারলে চাঁদপাহাড়ির বনেই পাঠাও। জানো, খরার তাড়নায় হরিণরা সেখান থেকে নেমে আসছে, আর তাদের পেছন-পেছন হেঁড়েলরাও।”

মানুষ মা বলল, “আতান্তরে পড়েই অমনি নিষ্ঠুর কথা বলি গো। দেখতে অমন সাতটা পরির মতো সুন্দর, কিন্তু ওদের পাল্লায় পড়ে গ্রামের আর সব কটা ছেলেমেয়ে যে বাঁদর বনে যাচ্ছে।”

কথাগুলো ছেলেমেয়েদের কানে পৌঁছতে বেশি দেরি হল না। উঠি-পড়ি করে মানু ছুটে গেল ছোট পণ্ডিতের বাড়ি। সেখানে চাতালে সারি-সারি ঠ্যাং কুলিয়ে বসে কুমড়ো-পাতায় করে নুন-ঝাল-মাখা পাকা পেয়ারার কুচো দিয়ে আরেক বার জল-খাবার করছিল। কালোবউ তার মাজাঘষা পেতলের ঘটি ভরা জল নিয়ে উবু হয়ে এক ধারে বসে ছিল। যার তেঁটা পাবে, তার গলায় জল ঢেলে দেবে। মানুষকে দেখেই বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে কালোবউ বলল, “খাবি নাকি, মেয়ে? বেড়ে মাখা হয়েছে, চেখে দ্যাখ না।”

এত বড়-বড় পাকা পেয়ারা দেখে অবাক হয়ে মানু বলল, “হরবিলাসকাকার গাছের মনে হচ্ছে?” কালোবউ বলল, “তা তো জানি না বাছা, ঝোড়ায় করে কলাপাতায় জড়িয়ে কে যেন রেখে গেছিল। তা চারটি মেখে দিলাম।” বলে একগাল হাসল। ওর মুখটা দেখতে মানুষ ভালই লাগছিল। সে এক নিশ্বাসে মা-বাবার কথটা বলে ফেলতেই ওদের সকলের কী হাসি। “সঙ্গে টিপিনটুপিন দিলে আমরা এখুনি রওনা দিই। মা, তুমিও যাবে নাকি সঙ্গে?” কালোবউ বলল, “যেতে তো ইচ্ছাই হয়। কিন্তু তাহলে আবার পণ্ডিতও সঙ্গ নেবে। একা থাকতে ওর ভূতের ভয়।”

দিনের শেষে সাত বাড়িতে সাতজনার কাজকাম সারতে হয়। রাতের খাওয়া সেইখানেই পায়। কালোবউ পারবে কেন? তস্য গরিব। তা খাবারটা পেলেও খায় না কেউ। ঘরে এনে সবাই মিলে খায়।

কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি গাঁয়ের সব বাড়িঘর। এক ঘরে ডাকাত পলে, কি বাঘ সৈঁদুলে, একটা ডাক দিলেই হল। তাই গ্রামবাসীদের ঠাকুরদাদের ঠাকুরদারা এমনি ঘন করে চালা তুলেছিলেন। এখন আর কারও ঘরে এক কণা সোনা বাকি নেই, ডাকাতরা আসবে কেন? গাঁয়ের লোকরা চাম্বাস করে, গোরু পালে। বনের কিনারায় জলাজমি, তার পাশে সরকারি

পক্ষী-সদন, সেখানে বুনো পাখি আশ্রয় পায়। এই এলাকায় পাখি মারা, ফাঁদ পেতে পাখি ধরা বারণ। জালে ঘেরা জায়গাটার বাইরে বড়বাবুর কোয়ার্টার। তিনি বলেন, তাঁর সামনে-পেছনে দু'জোড়া চোখ। গাঁয়ের জনাদেশক লোক এখানে পাহারাদারি করে। ভেতরে মালীরা আছে। তারা গাছ-গাছলা দেখে; পাখিদের জন্যে দানাপানি সময়মতো দেয়। সকলেরই দিন আনা দিন খাওয়া। খরা হলে পাখিদের দানাপানি বন্ধ হয়ে যাবে। আগে যারা শীতের শেষে বাঁক বেঁধে উত্তুরে ডানা মেলে দিত, এখন তাদের অনেকে এখন থেকে যায় না। খেতে না পেলে শুকিয়ে মরবে। আর তারা দূর পাল্লায় উড়তে পারবে না। কী কষ্ট। তবে গাঁয়ের লোকে ওখানে চাকরি পায়।

গয়লাবাড়ির মেজো ছেলে গণেশ পক্ষী-সদনে নতুন বহাল হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় সে বাড়ি এল, গামছার মধ্যে একটা মরা বুনো হাঁস নিয়ে। হাঁসটা অমনি সোনার চোখে পড়ে গেল। তাকে কিছু বলতে হল না। মুখ ঘুরিয়ে একটুখানি ভুরু কঁচকে, ডাক দিল “পিয়াটা আছিস?” পিয়া তার চেয়ে এক বছরের বড়। কাজ সেরে সোনা রোজ এসে তার কাছে দ্বিতীয়ভাগ পড়ে যায়। ওদের সাতজনের পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ হয়েছে। তবে পড়া বন্ধ হয়নি।

শীতকালে ছাড়া রোজকার মতো আজও সোনা বলাইজ্যাঠার গোরুর ঘরে ধুনো দিয়ে, পাছে সাপখোপ ঢোকে তাই নালার মুখে বাঁপ দিতে গেছিল। জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। তবে ঐ সাতজনের পরানে ভয়ডর বলে কিছু নেই। গোয়ালঘরের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে, জল পড়ছে; নালার মুখে জালের বাঁপ লাগিয়ে দরজার আগল তুলতে যাবে, এমন সময় একটা বিকট ঢ্যাঙা কালো লোক টলতে টলতে এসে, ওর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মুচ্ছা গেল নাকি মরেই গেল মালুম দিল না। একবার না তাকিয়ে দেখেই “ওরে দিদি, কোথায় গেলি!” বলে উঠিপড়ি করে ছুট।

পিয়াও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল, “ওরে চূপ! চূপ কর! জ্যাঠার সবে আপিমের ঘুমটে লেগেছে। জেগে উঠলেই পেটের ব্যথা আবার চাগিয়ে উঠবে। কী বলবি বল!” সোনা নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে, ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে লোকটাকে দেখাল। তখনও হাত-পা এলিয়ে পড়ে আছে, তারার আলো চোখ-সওয়া হলেই দেখা গেল। কষ বেয়ে একটু একটু রস গড়াচ্ছে, ছোট বাচ্চাদের যেমন হয়। পিয়ার তো চক্ষু-স্থির! ভাল করে দেখে লোকটার এক পায়ে লোহার বেড়ি। হয়তো জেল-পালানো খুনে গুণ্ডা কয়েদি। সোনার মুখের দিকে চেয়ে পিয়া বলল, “ওকে পাখি-সদনের বড়বাবুর কাছে সঁপে দিই। যা করবার তিনিই করবেন।”

॥ তিন ॥

পিয়ার কথা শুনে সোনা বলল, “করবার তো একটাই কাজ দেখছি। ওকে সারিয়ে তুলতে হবে। কামারদাদুর বাড়ি থেকে যে উকোট্টা এনেছিলি, সেটা দিয়ে ওর বেড়ি কেটে দে আগে।” পিয়া আকাশ থেকে পড়ল, “কী বলছিস। ও যে বিষম বে-আইনি কাজ। ও আমি পারব না।”

সোনা হাসল, “ওই যে মামি হাঁস রাঁধছে গন্ধ পাচ্ছি, সেটা তুই খাবিনে?”

পিয়া উৎসাহের সঙ্গে বলল, “একটা না দুটো রে! আগে কাকু আরেকটাও ধরেছিল।”

“ঘুড়ির সুতোয় আঁকশি বেঁধে লটকান লাগিয়ে, না রে?”

“হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোকে আর শেখাব কী!”

সোনা কড়া গলায় বলল, “শোন দিদি, ওটাও বে-আইনি। তুই এই লোকটাকে ধরিয়ে দিলে, আমিও থানায় গিয়ে গণেশকাকুর কথা বলে দেব।” পিয়া এমনি অবাক হয়ে গেল যে, মুখে কথা সরে না। সোনা এমন কথা বলতে পারল? সোনা নরম গলায় বলল, “লোকটা প্রাণের ভয়ে নিশ্চয় যেখানে নতুন রেলের লাইনে কয়েদিরা খাটছে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। সে কি চাট্টিখানি পথ!”

পিয়া বলল, “কোথায় ওকে লুকোব? তারপর কী হবে?”

“ছোট গোয়ালে, খড়ের গাদার পেছনে। পরশু অমাবস্যার রাতে আমরা সবাই চাঁদপাহাড়ির বনে চলে যাচ্ছি। ওকেও নিয়ে যাব। ও আমাদের মা হবে।”

তাই শুনে পিয়া হেসেই কুটোপাটি! “ওই তাল-ঢ্যাঙা কালো লোকটা মা হবে! আর হাসাসনি সোনা।”

সোনা বলল, “চেহারা দিয়ে মা হয় নাকি? আবার কী হল?”

পিয়া বলল, “ওকে তুলবে কে? আগে জলের ছিটে দিয়ে মুচ্ছা ভাঙানো যাক।”

হঠাৎ লোকটা কথা বলল। জড়ানো-জড়ানো অস্পষ্ট গলা। “আমাকে তুলতে হবে না। ধরো তোমরা, নিজেই যাব। বেড়ি পরে হাঁটা বড় কষ্ট।”

আধ ঘণ্টার মধ্যে বেড়ি কাটা হয়ে গেল। গোরু দুইতে সোনা ওস্তাদ। বলাইজ্যাঠার বড় গাইকে যখনই দোয়া যাবে আধ ঘটি মিষ্টি দুধ তো পাবেই। সোনা লোকটার থুতনির নীচে আঁচল রেখে, একটু করে দুধটি তার গলায় ঢেলে দিল। আধবুড়োমতো, দাঁতগুলো উঁচুপানা। দেখতে ভাল না। সোনা তার মুখ মুছিয়ে বলল, “কেন ধরা পড়লে?” কেন মন্দ কাজ করলে-টরলে নয়। কেন গরিবরা মন্দ কাজ করে, সোনা তা খুব জানে।

লোকটা একটু হাসল মনে হল, “বুড়ো হচ্ছি, অত কি ছুটতে পারি?”

“না পারো তো ও কাজ করতে গেলে কেন?”

“সঙ্গদোষে মা রে, ক্ষমা করে দাও। তুমি কি অন্ধকারে দেখতে পাও?”

পিয়া উকোট্টা চালের বাতায় গুঁজে রেখে বলল, “ওরা সাতজনেই পারে। দ্যাখো বুড়ো—”

সোনা বলল, “ওকে এখন থেকেই তিতুকুটির মা বলে ডাকা অভ্যেস কর, দিদি।”

বুড়ো বলল, “সেই ভাল। গৌপটা কিন্তু ফেলতে পারব না, সোনা। উটি আমার বড় শখের জিনিস। ঘোমটা দিয়ে থাকব, বউমানুষ। কেউ টেরও পাবে না।”

সোনা বলল, “সে দেখা যাবে।”

সত্যিই কাকপক্ষীও টের পেল না। পিয়াকে বলাও যা, নুড়ি বেঁধে কুয়োতে ফেলে দেওয়াও তা। তবে বেশি কথা তার না জানলেই ভাল। আর কাউকে কিছু বলা নয়। কালোবউকে তো নয়ই। না নিলে কাল্লাকাটি করে সর্বনাশ বাধাবে। নিলে,



ছোট পণ্ডিত ঝগড়া করতে করতে সঙ্গে যাবে। ছোট পণ্ডিত পাঠশালা না খুললে, গাঁয়ের একটা ছেলেমেয়েও ঘরে থাকবে না।

কালোবউয়ের কপালের মধ্যখানে বোধহয় অদেখা এক চোখ আছে। তাই দিয়ে না-বলা কথাও সব টের পেয়ে যায়, তা লোকে তাকে যতই বোকা-বোকা বলুক না কেন। রাতে সোনা-পিয়ার চুলে আঁটো করে বেণী বাঁধতে বাঁধতে মা জিজ্ঞেস করল, “হ্যাঁ রে, তার মুখে কোঁনো দাগটাগ আছে কি, যা দিয়ে নাকি দাঁরোগা তাকে চিনতে পারবে?”

সোনা বলল, “কই, না তো। হটকা, ঢ্যাঙা, দাঁতগুলো উঁচু। কিন্তু তোমার তো তার বিষয়ে জানবার কথা নয়, মা। কে বলল?”

সোনার বুকটা ছাঁত করে উঠেছিল।

কালোবউ বলল, “কেঁউ বলেনি। আমি বাঁদাবনে বাঁতের ওষুধ তুলে ফেরার সময়, নিজের চোঁখে দেখেছি ঐ পিয়া আর তুই তাকে ছোট গোঁয়ালে ধরে নিয়ে গেলি। ঐ বিচুলি দেখতে কিন্তু আসছে মঙ্গলবার হরবিলাসবাবু যাবে।”

সোনা মনে-মনে হাসল। তার অনেক আগেই ঘোমটা পরা তিতুকুটির মা-কে সঙ্গে নিয়ে ওরা সাতজন চাঁদপাহাড়ির ঘন বনে গা ঢাকা দেবে। কারও সাখি থাকবে না দুঃখী লোকটাকে ধরে। মা-কে মেরে ফেললেও কাকেও বলবে না, সে-বিষয়ে সোনার কোনো সন্দেহ ছিল না। তবু এক-কান ছিল, দু-কান হল। অমাবস্যার রাতটা এলে বাঁচা যায়।

ছোট পণ্ডিত রাতে চোখে ভাল দেখে না। সঙ্গে লাগতেই চারটি যা হয় খেয়েই পাঠশালার লাগোয়া দক্ষিণের ছোট ঘরের চারপাইতে শুয়ে ঘুমিয়ে কাদা। মা ছোট্ট পাকশালটি ধুয়ে লেপে রাখছে, এরা সাতজন চাতালে বসেছে। নোনতা সবাব বড়, দেড়-দু বছরের তো হবেই। সে বলল, “পিয়া বলছে ওর নাম নাকি কেঁট। মা সেজে সঙ্গে যাবে, তাই খোনা গলায় কথা কইতে অভোস করাচ্ছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলা হবে, ও আমাদের মা, ছোট পণ্ডিতের বউ, সঙ্গে যাচ্ছে। পিয়া বলছিল গোঁপটা বাদ দিলে নাকি হঠাৎ দেখে কোনো তফাত মালুম দেবে না।”

কালোবউ কোন্ ফাঁকে, কাজ সেরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ছিল, ওরা টের পায়নি। এবার এমন চমকে উঠল সে আর বলার নয়, “অ্যাঁ! ঝঁলিস কী রে? ঝঁকিয়ে একবার দেখে আসতে হবে তো।”

ওরা সাতজনে আঁতকে উঠল, “ও মা, তোমার পায়ে পড়ি, অমন কাজও কোরো না। শেষ মুহূর্তে জানাজানি হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। এই দ্যাখো না, আমরা যাব আর আসব। চাঁদপাহাড়ির নদীর মুখ কেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেখে, শাবল কোদাল দিয়ে মাটি সরিয়ে আবার কেমন ঝরনা খুলে দিই দেখবে। আবার নদীতে সোনার দানা ভেসে আসবে, বালি চিকচিক করবে, পিয়াসোনার দুঃখ ঘুচবে। আর—আর!” এই বলে নোনতা থামল।

কালোবউ তেরিয়া হয়ে উঠল, “আঁর—আঁর কী রে হতভাগা? সেখানে তোদের পঁরির মতো সুন্দর মা-বাবারা ঝঁকিয়ে আছে। এই ঝঁঝি তোদের আশা!” কালোবউ ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকে।

সবাই উঠে আসে, “আরে না, না, তুমি যেতে পারবে না বলেই না কেঁটকে তিতুকুটির মা সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সে তোমার পাটের মণ্ডা দিচ্ছে আর হেসেই খুন হচ্ছে। তুমিও খুশি হও।”

কালোবউ চোখ মুছে বলল, “তিলের নাড়ু, শুকনো খোলায় চিড়েভাজা, গেল বছরের আমসস্ত্র সঙ্গে দেব। তাতে ইঁবে না?”

“হবে গো মা, হবে। তবে আটটা পুঁটলি দিও। তিতুকুটির মায়ের নাকি বড্ড খিদে।”

॥ চার ॥

সময় কারও জন্য বসে থাকে না। দেখতে দেখতে দুটো দিন গড়িয়ে অমাবস্যার রাত এসে গেল। গ্রামের লোক অমাবস্যাকে যে ভয় পায়। গাঁয়ের পথ সুনসান। রাত অবধি সাত বাড়িতে সাতজন তাদের নিত্যকার কাজকর্ম সেরেছে, কলাপাতায় মুড়ে যাকে যা খাবার দিয়েছে হাত পেতে তাই নিয়েছে। সোনা একবারও ছোট গোয়ালের দিকে তাকায়নি।



সবাই যখন খাওয়াদাওয়া সেরে কালোবউয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে ঘর ছেড়ে পথ ধরল, মা মুখে তাদের একটি কথাও বলল না, খালি মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল। খিড়কিদোরের বাইরে কুলগাছের নীচে তিতুকুটির মা ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। মা তাড়াতাড়ি খিড়কিদোরে আগল দিয়ে, চাতাল থেকে পিদিম তুলে ঘরে গেল। আলোটাও মিলিয়ে গেল। পিয়া বলল, “মা বোধহয় আমাদের জন্যে কাঁদছে।”

এই বলেই পিয়া আর সোনা চোখ মুছতে লাগল। তিতুকুটির মা তার কাঁধের ঝোলায় জলখাবারের ভাগটি পুরে, দু হাতে দুজনার হাত ধরে, এগিয়ে চলল। ওদের মনে কেমন সাহস এল। কারও মুখে কথাটি নেই। নির্জন পথে আটজনের পায়ের শব্দ যেন গাছ থেকে ঝুপঝুপ করে বড়-বড় শিমুলফুল পড়ার মতো শোনাতে লাগল। সবার কাঁধে একটি করে ঝোলা, তাতে একটি গামছা, এককুচি কাপড়-কাচা সাবান, একটা করে দাঁত-ভাঙা চিরুনি, জল খাবার জন্য একটা করে মাটির ভাঁড় আর খাবারের পুটলি। বড় বড় পা ফেলে তারার আলোয় পথ দেখে, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা এক কোশ পথ পেরিয়ে চাঁদপাহাড়ির পাহাড়তলিতে মুণ্ডেশ্বরীর বনের ধারে পৌঁছে গেল। সেখানেও থামা নয়। আরও খানিকটা বনের মধ্যে সৈদোলে তবে যেন নিশ্চিন্দ হওয়া যায়। পিয়া তিতুকুটির মায়ের হাতে একটা ছোট ঝাঁকি দিয়ে বলল, “বেশি কথা-টখা বোলো না যেন মা। বৌচাদার গোয়েন্দা-বইতে আছে, দারোগাৱা গাছ সেজে বনের মধ্যখানে গাছ হয়ে লুকিয়ে থাকে। কয়েদিরা বেশি কথাটখা বললে অমনি টের পেয়ে কঁয়াক করে ধরে ফাঁসি দেয়।”

তিতুকুটির মা শিউরে উঠে ঠিক কালোবউয়ের নকল করে বলল, “ও মা, কী বলে! গাঁয়ে কাঁটা দেয়!”

সঙ্গে-সঙ্গে বৌচা, কটা, চটা একবাক্যে বলে উঠল, “চুপ!” বনের ভিতরে তারার আলো না পৌঁছলেও, স্যাঁতসেঁতে জায়গায় একরকম ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছিল, তার গা থেকে আলো বেরুচ্ছিল। ততক্ষণে আরও ঘন্টাখানেক কেটে গেছে, হেঁটে হেঁটে হেঁটে হেঁটে সোনা পিয়ার পা আর চলে না। ওরা কেবলি পেছিয়ে পড়ে। বনের মধ্যে একটুখানি ফাঁকা জায়গা

তারার আলোয় আলো হয়ে আছে। সেখানে পৌঁছে নিচু গলায় তিতুকুটির মা বলল, “একটু বসলে হাঁত না? এরা আর পায়ছে না। আমারও পা কঁকঁকঁ করছে।”

“তা বটে। মেয়েরা আর কত হাঁটবে!” এই বলে নোনতা তিতুকুটি খুব খানিকটা হেসে নিল। তাদের অবস্থাও কাহিল হয়ে এসেছিল। ধূপধাপ যে যেখানে পারে বসে পড়ল। বসা মানেই শুয়ে পড়া, শোয়া মানেই ঘুম। এক ঘুমেই রাত কাবার। প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে কী একটা পাখি গাছের ডালে বসে খালি বলতে লাগল, “কে-ও? কে-ও?” তাই শুনে ধড়মড় করে আটজন উঠে বসল। আঃ কী আরাম। ব্যথা-জ্বালাগুলো সব দূর হয়ে গেছে। কানে এল ঝিরঝির শব্দ। ওমা, এই তো পাহাড় থেকে নেমে আসছে সকলের সেই চেনা পিয়াসোনা নদী। বৌচা বলল, “এখানে ওর নাম বুড়োনদী। নতুন খাতে নামলে তবে ওর নাম হয় পিয়াসোনা। পণ্ডিতমশাই বলেছে।”

এই জলই পিয়াসোনা গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাবে। পিয়া একটা পাতা ভাসিয়ে দিল। “যাক, ও বাড়ি যাক। কিন্তু এখানে এত ময়ূরের পলক পড়ে আছে কেন?” তাই তো, সবাই দেখে দেখে অবাক হল। কটা আর চটা বেশি কথা বলে না, তার ওপর চটা একটু তোতলা। পণ্ডিত বলে, ওর জিভের কোনো জড়তা নেই। লজ্জা পায়, তাই তোতলা। রেগে গেলে লজ্জা ভুলে, না থেমে, পাঁচ মিনিট এক-টানা বকে যায়। এখন সে হঠাৎ বলল, “পাখিকেও ঠকায়, এত খারাপ!”

“কে ঠকায়? কে ঠকায়?”

“পাখিওয়ালারা। এখানে ওরা ময়ূর ধরে। চেয়ে দ্যাখ, ফাঁকার ধারে-ধারে বড় বড় পাতাওয়ালা গাছ। চাঁদ উঠলে কি রোদ উঠলে গাছতলায় চকরা-বকরা ছায়া পড়ে। ওই রকম জায়গায় বাঘরা ঘুমোয়। হঠাৎ দেখলে মালুম দেয় না—”

সোনার কী হাসি! “ওরে, বাঘের গায়ে কি ময়ূরের মতো পালক হয়? কী বলিস!”

পিয়াও বলল, “বোকা! ভারী বোকা! বাঘ আর ময়ূর কি এক?”

চটা এবার সত্যি চটে গেল, “ভারী মূখ্য! ময়ূরেতে বাঘেতে বড় ভাব, তাও জানিস না। বাঘরা যখন শুয়ে বসে থাকে,

ময়ূররা এসে তাদের নাচ দেখায়। এমনিতে মানুষ দেখলেই উড়ে পালায়। ময়ূর ধরা বড় শক্ত। কিন্তু ধরতে পারলে অনেক দামে বিক্রি হয়। বড়লোকরা ময়ূর পোষে, নয়তো ময়ূরের মাংস খায়, তা জানিস্? ময়ূরের পালকের হাতপাখা হয়। লোকে পাগড়িতে পরে। মানুষরা তাই বাঘের গায়ের হলদে কালো ডোরার মতো করে কাপড় ছুপিয়ে গাছতলায় পেতে রাখে। ময়ূররা ভাবে ঐ বুঝি বাঘ। অমনি তাদের কাছে নেমে আসে নাচ দেখাতে। ছুপানো কাপড়ের ওপর জাল পাতা থাকে, তাতে ময়ূরদের পা জড়িয়ে যায় আর আড়াল থেকে পাখি-ধরারা বেরিয়ে আসে। ভয়ের চোটে ময়ূররা ইদিক-উদিক চায়, ডানা ঝাপটায়, পালক খসে যায়। পাখিধরারা তাদের ধরে ফেলে আর খসে-যাওয়া পালকের মধ্যে ভাল যেগুলো, সেগুলোও কুড়িয়ে নেয়, বাকি সব পড়ে থাকে।

একথা শুনে কারও মুখে কথা নেই। সকলের মনে হচ্ছিল, এ-জায়গাটা তো একটুও ভাল নয়, খুব বিস্ত্রী। তারই মধ্যে তিতুকুটির মা উঠে পড়ে বলল, “তৌকে এত কঁথা কঁে বলল, বাঁছা?”

চটা বলল, “মাঘের মেলায়, পাখিওয়ালার ছেলে রঘুয়া।”

মা বলল, “এবার চাঁটি কিছু মুখে দিয়ে, জল খেঁয়ে, চল হাঁটা দেওয়া যাক। জায়গাটা ভাল না।” আধ ঘন্টার মধ্যে হাত-মুখ ধোয়া, খাওয়াদাওয়া সারা। ছেঁড়া ময়ূরের পালকের দিকে শেষবারের মতো তাকিয়েই রওনা হওয়া!—

॥ পাঁচ ॥

পাহাড় দেখে হাসি পেল। ওই নাকি চাঁদপাহাড়ি! কয়েকটা গাঁয়ের ছেলে বড়-বড় ছাগল চরাচ্ছিল। এখানে ঘন বনের পর গাছপালা পাতলা হয়ে এসেছে আর পায়ের নীচের মাটি হয়েছে একটু একটু ঢালু। চ্যাপ্টা করে পা পড়ে না। তাই বলে পাহাড়? হোঃ। তিতুকুটির মা’ও মনে হল নাক সিটকে ঘোমটার ভেতর থেকে বলল, “ঐ মা! ঐর চেয়ে আমার বাঁপ-পিতেমোর অযোধ্যা-পাহাড় টের-টের উট্টু।”

ওরা সাতজন হেসে উঠল, “হিমালয়ও ছাড়িয়ে গেছে বোধহয়?”

মা চটে গেল, “তাঁ তৌরা হাসতে পারিস্, বাছা। হিমালয়ের সমান বঁলছি না, কিন্তুক কঁছাকাঁছি তো বটেই। সেখানে পাহাড়-চঁড়ুয়ারা পাই হড়কে যাবে বলে কৌমরে দড়ি বেঁধে ঝোঁলে। আমি নিজের চোঁখে দেখেছি, হ্যাঁ।”

নোনতা মুচকি হাসল, “এটাও কম যায় না মা, ঠিক পাহাড় না হলেও ঢিপি তো বটেই।”

এই কথা বলতেই পায়ের তলায় কেমন একটু গুমগুম শব্দ হল, আর সঙ্গে-সঙ্গে চাঁদপাহাড়ির গা-টাও একটু কঁেপে উঠল। নোনতা বলল, “ও কিছু নয়। ভূমিকম্প। তোরা ভয় পাচ্ছিস্ নাকি?”

সত্যি কথা বলতে কী, মেয়ে দুটো তো ঘাবড়ে গেছিলই, আর এতক্ষণ ঘোমটা পরে মেয়ে সেজে থেকে থেকে, তিতুকুটির মা’ও বোধহয় একটু ভিত্ত হয়ে গেছিল। আসবার আগে জোরজোর করে বিনুকের ক্ষুর দিয়ে, ওর সাধের গোঁপ জোড়াকে চটে ফেলাটা পিয়ার উচিত হয়নি। ছোট গোয়ালের অন্ধকারে একটু কেটেকটেও গেছিল। গাঁদাপাতা-বাটা মাখিয়ে রক্তপড়া বন্ধ করতে হয়েছিল। তার

একটা ভাল ফলও দিয়েছিল। আপনা থেকেই কথাগুলো খোনা-খোনা হয়ে গেছিল। প্রায় কালোবউয়েরই মতো। একথা বলাতে কেঁষ খুব চটেছিল। তাতে নোনতা বলেছিল, “মেয়েমানুষের মতো কথায়-কথায় রাগ!—পেয়াদা পিটিয়ে পালিয়েছিলে কী করে জানি না, বাপু।”

কেঁষ বলেছিল, “ওমা! পেঁয়াদা পেঁটালাম কৌথায়? সন্ধে নাগাদ ঝড় উঠল, চাঁরদিক ঘুরঘুড়ি, বন্দুকধারীরাও ভঁয়ে মরে, এই বুঝি মাথায় বাঁজ পড়ে। ঝড়ের সময় খোঁলা মাঠে দাঁড়াতে নেই। রেলের লাইন ঘেঁষে য়েঁ য়েঁদিকে পারি ছুটলাম। ছুটতে ছুটতে যখন চোঁখে অন্ধকার দেখছি, তখনই সোনা-মা’র পায়ের কাছে মুচ্ছা গেলাম। ঠিক কি না বল রে, সোনা।”

সোনা বলল, “ঠিক। কিন্তু পায়ে বেড়ি-পরা কয়েদি কি মিছিমিছি হয়েছিলে?”

“হ্যাঁ গো মা, ঐক্কেবারে মিছিমিছি।” এই বলে পথের ধারে পাথরের ওপর বসে পড়ে মা বলল, “ঐ নীলডাঙার ইন্সটানে কঁটা লোক মামাকে বঁলল, ‘পঁয়সা চাইতে লঁজ্জা কঁরে না? কাঁজ কঁরে দে, পঁয়সা পাবি।’ এই বলে হাতে পুঁটলি ধরিয়ে দিয়ে মালগাড়ি ভাঁঙতে চলে গেল। আমি গাঁছতলায় দাঁড়িয়েই রইলাম। বঁন্দুকধারীরা সেইখান থেকে আমায় ধঁরল। পুঁটলি ভঁরা ছেনি হাঁতুড়ি বাঁটালি। দিল আমাকে চালান কঁরে। আমার ঐকটা কঁথাও বিশ্বাস কঁরল না। সেই অন্য লোকগুলোর কৌনো পঁন্তাই পঁওয়া গেল না। আমাকে ভিত্ত বোলো না। কঁষ্ট লাগে। ঠল, এগুনো যাক—ওঁ বাঁবা! আঁবার কী হল?”

হবে আবার কী? আবার সেই গুমগুম শব্দ আর পাহাড়-কাঁপুনি। ছাগল চরাচ্ছিল যারা, তারা এবার মাটিতে শুয়ে পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল। একজন বলল, “পাহাড়ে চোড়ো না বাবা তোমরা। বোঙা রাগ করে।”

বৌঁচা বলল, “কেন, রাগ করবে কেন? আমরা তাকে খুশি করতে এসেছি। তোমরা নীচেই থাকো, আমরা তাকে খুশি করেই ফিরে আসছি।”

“তাহলে পাহাড়কে নমো করো।”

আটজনে চাঁদপাহাড়িকে নমস্কার করে, চড়তে লাগল। বড় গাছ না থাকলেও মাথার চেয়ে উঁচু সব ঝোপঝাপ। দেখতে দেখতে ওরা গাঁয়ের ছেলেদের চোখের আড়াল হয়ে গেল। উঠছে আর মনে হচ্ছে পাহাড়টা তখনও একটু যেন কাঁপছে। তিতুকুটির মায়ের কী ভয়! “ওঁরে, বোঁঙা সত্যি চটেনি তো?” কটা বলল, “না, না, গা মোড়ামুড়ি দিচ্ছে। বুড়ো হয়েছে তো।”

এমনি সময় “হৈ বাবুরা, থামো গো, আমিও আসছি।”

সোনার চেয়েও বেঁটে একটা ছেলে হাতে খুঁদে তীর-ধনুক। দেখে ওরা হেসে বাঁচেনা। মুখ লাল করে ছেলেটা বলল, “হেসো না। এই দিয়ে আমার বাবার বাবা উড়ন্ত শকুন নামায়। আমাদের শিকারি কুকুররা খায়।”

শিকারি কুকুর শুনে ওরা অবাক। ছেলেটা বলল, “আমার নাম পাঁচুয়া, আমি মোড়লের নাতি। জানো, বোঙা আমার বন্ধু। তাই বাবা বলল, ওদের সঙ্গে যা, তোর বন্ধুকে খুশি করে আয়। গাঁয়ে এ-সাল বড় কষ্ট।”

সোনা বলল, “বন্ধু তো কষ্ট পাও কেন?”

“কী জানি। কোনো দোষ করে থাকব। বোঙা আমার প্রাণ

বাঁচিয়েছিল। তখন আমি আরও ছোট। নীচের বনে অজগর আমাকে পাক দিয়ে ধরেছিল। সবাই ভয় পাচ্ছিল তীর মারলে যদি মোচড় দেয়।”

“তারপর ? তারপর ?”

“তারপর সেই উঁচু গাছটার ওপর থেকে বোঙার চাকর নেমে এসে এক কোশে অজগরের গা কেটে দু-টুকরো করে দিল। পাঁচ টিলে হল, আমিও পড়ে গেলাম। ঠাকুরদা চাকরটাকে আমাদের গাঁয়ে থাকতে বলল। বলল রোজ দুবেলা পূজো দেবে। যা বলবে তাই হবে। সে বলল ‘আমি বোঙার বাড়ি যাচ্ছি। তবে জল শুকোলে পিয়াসোনা গাঁও থেকে আমার নিজের লোকরা এসে তোদের দুঃখ দূর করে দেবে।’ তাই ঠাকুরদা বলছে, আমি বোঙার চাকরের চাকর, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো।”

ওরা বলল, “চলো তাহলে।”

আসলে পাহাড় খুব উঁচু নয়, বরং চারদিকের মাটি চ্যাপ্টা থালার মতো বলে অনেক দূর দেখা যায়। যেখানে আকাশের সঙ্গে মাটি মিলেছে, সেখানে নীল ধোঁয়া-ধোঁয়া পাহাড়। তিতুকুটির মায়ের কী আনন্দ, “ওই যে হিমালয়। ওই নিশ্চয় হিমালয়। আহা, পীপ চোখেও দেখতে পেলাম।” বলে বারবার নমো করতে লাগল।

বৌঁচা বলল, “হিমালয় না গো মা, হিমালয় হল বরফের পাহাড়। আরও অনেক দূরে, অনেক উঁচু।”

“না রে বাঁছা, অদ্ভুত যাব কমনে ? ঐই আমার যঁথেষ্ট, ঐই আমার হিমালয়। বৌঁচা বড় দয়ালু !”

মুখ্য বুড়োকে কে বোঝায়।

যেখানে পাহাড়ের ওপরটা গোল হয়ে এসেছে, সেখানে পৌঁছে পাঁচুয়া বলল, “ঘুরে ও-পাকে গেলে ধস নামাটা বোধহয় দেখা যাবে।”

নোনতা অবাক হল, “কেন, তুই ঠিক জানিস না ?”

পাঁচুয়া মাথা নাড়ল, “বোঙার পাহাড়ে আমরা পা দিই না। দশ বছর আগে গুজুদা লুকিয়ে পাহাড় চড়ে সবুজ সাপ মেরে পুড়িয়ে খেয়েছিল, তাই বোঙা রোগে মেঘ ফুটো করে জল নামিয়ে পাহাড়ের আধখানা ভাসিয়ে দিয়েছিল। সে তো সবাই জানে। তাই আমরা পাহাড় চড়ি না।”

সোনা বলল, “এ রাম, ছিঃ ! সাপ খেল কী বলে ?”

পাঁচুয়া ভারী বিরক্ত, “কেনে, খাবে না কেনে ? তোমরা মাছ খাও না ? মুণ্ডু কেটে ফেলে দিলে মাছের সঙ্গে সাপের কোনো তফাত থাকে না। ওঝারা মুণ্ডু নিয়ে যায়। সাপের বিষ দিয়ে ওষুধ হয়। ককট রোগ সারে। বুড়ো ঠাকুরও তাই বলেছিল।”

বুড়ো ঠাকুর শুনে এরা চমকে উঠল। “তিনি কে ? তাঁকে কোথায় পেলি ?”

“আরে সেই তো অজগর মারল। আবার কিছু দিন আগেও এসে বলে গেছেন, পিয়াসোনা গাঁ থেকে তাঁর নিজের লোকরা দেশের দুঃখ দূর করতে আসবে। তাই ঠাকুরদা আমাকে পেঠিয়ে দিল। বলল, বোঙার চাকরদের বোঙা খেমা করবে।—মাটি কাঁপছে বুঝতে পারছ ?—চলো ও-পাকে যাই।”

টিলার গোল চুড়োর অন্য দিকটা ঠিক যেন কেউ খানিকটা খুবলে নিয়েছে। সেখানে একটা কামড়ানো-মতো জায়গা ছোট



বড় পাথরে বোঝাই হয়ে আছে। তারই তলা থেকে জল চৌয়াচ্ছে। সেই জলগুলো কয়েকটা সরু নালার মতো হয়ে বুর-বুর করে নেমে চলেছে। ওই নাকি বুড়োনদী ! বড় ঠাকুর যার নাম দিয়েছিল পিয়াসোনা ! হাসি পায়। পাহাড়ে পা দিয়ে অবধি ঐ জেল-ভাঙা বেড়ি-পরা কয়েদি তিতুকুটির মায়ের ভয় দেখে কে। মুখে কথাটি নেই। পাহাড়াটা একটু নড়লেই ‘ওঁ বাঁবা’ বলে সোনা আর পিয়াকে জাপ্টে ধরছে ! সত্যিকার মেয়েমানুষের বাড়ি। তবে নানা থানে ঘুরেছে, জানে শোনে অনেক।

অনেকক্ষণ ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে শেষটা বলে কি না, “নদীর যে-জায়গায় উচ্ছ, তার মুখটা কেন চাপা থাকবে ? তাই জল বেরুতে পারছে না। আমার বাপ-পিতেমোর গাঁ ধানজলির কাছেই টিলার ওপর রাই নদী বুড়বুড় করে পাঁচ ছ-টা গর্ত দিয়ে মাটি থেকে ওঠে। মোড়লরা তার ধারে-কাছে কাঠকুটো নুড়ি-মাটি জমতে দেয় না। ওগুলো সরিয়ে দিলেই বুড়োনদীর জলও ছাড়া পাবে।”

নোনতা তিতুকুটিরও উঠে কাছে এল। “যা বলেছ, মা। বড় বড় গাছের ডালের খোঁচা দিয়ে উৎসের মুখের পাথর সরিয়ে দিলেই নদীও ছুটে বেরবে।”

বৌঁচা বলল, “মাটির তলায় জল জমা হচ্ছে। বেরুবার জন্য গজাচ্ছে। তাই গুমগুম আওয়াজ দিচ্ছে। ঠেলছে, তাই ভূমি কাঁপছে।”

চটা বলল, “মা’কে আর পাঁচুয়াকে নিয়ে আমরা মোটে নয় জন, তাতে কী করে হবে ? গর্তের নীচে নামা যাবে না, এমনি তোড়ে জল ছাড়া পাবে, সব ভাসিয়ে নেবে। কম-সে-কম পঞ্চাশজন লোক লাগবে।”



সারো অঙ্গে কোমলতার পদশ

এখন স্নানের পরে এক
কোমলতার নতুন অনুভূতির
জগতে প্রবেশ করুন।
নতুন পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীম
সাবানের সমস্ত গুণই ছড়িয়ে
পড়বে আপনার সারা অঙ্গে...
আপনার ত্বককে করে তুলবে
মোলায়েম ও কোমল।



নতুন
পণ্ডস্
কোল্ড ক্রীম সাবান
পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীমের
সমস্ত গুণে ভরা

এর মধ্যে পাঁচুয়া কখন কেটে পড়েছে, কেউ টের পায়নি। তিত্তুকুটির মা বলল, “ব্যাটা ভয়ের চোটে ভাঁগেনি, এটা ঠিক ! ওঁ কী ! ওঁ কী !”

॥ ছয় ॥

কুলকুল কলকল করে ঢেউ তুলে ফোয়ারা ছুটিয়ে এ আবার কোন্ নদী চাঁদপাহাড়ির পাহাড়তলি থেকে ওপর দিকে ছুটে আসছে !! সবাই শুনে অবাক ! অবিশ্যি একশো ছেলেমেয়ে একসঙ্গে গান গেয়ে হাঁটলেও এমনি শোনা যায়। টিলার মাথা থেকে অবাক হয়ে দেখে ওরা চাঁদপাহাড়ির পাহাড়তলির গাছের ছায়ার তলা থেকে পিলপিল করে মানুষের শ্রোত পাহাড়ের ওপর উঠে আসছে। আসছে আর ডাকছে, “ও নোনতা, তিত্তুকুটি, বোঁচা, কটা, চটা ! ওরে সোনা, ওরে পিয়া, কোথা গেলি ধোঁকা দিয়া !” ডাকছে আর হাঁপাচ্ছে আর সামনে যারা তারা বলছে, “ওরে বাবা রে ! দম যায় রে ! কে কার চেয়ে কম যায় রে ! ও ব্যাটারা ঘরছাড়া ! তবু কেন দিসনে সাড়া ! মুখ খুবড়ে পড়ব কিনা বল !” পেছনে যারা তারা খালি বলে, “চল্ চল্ চল্ চল্ !”

তখন ওরা তিত্তুকুটির মা'কে নিয়ে আটজন উঠে পড়ে দুহাত তুলে ডাক দিল, “আয় আয় আয় আয় ! চট্জলদি আয় ! বেলা বয়ে যায় !”

তিত্তুকুটির মা বসে পড়ে বলল, “পাঁথর ঠেলার লোক তো এঁল, পিয়াসোনা গাঁ খালি করে। কিন্তু এই ন্যাড়া পাহাড়চুড়োয় পাঁথর ঠেলার গাঁছের গুঁড়ি কোথায় পাবি ?”

নোনতা তখন ভাঙা গলায় চ্যাঁচাতে লাগল, “ওরে ! বোঙা তাও জুটিয়ে দিয়েছে রে ! ঐ দ্যাখ্ !”

দেখবে কী ! মোড়লের গাঁয়ের একশো জোয়ান ছেলে দশটা শক্ত গাছের গুঁড়ি কাঁধে নিয়ে হুম-হাম হুম-হাম করতে করতে উপস্থিত হল ! তারপর আর কী ! দুই দল এক হয়ে দশটা গুঁড়ির ঠেলা দিয়ে দশটা পাথর আলগা করে দিতেই ছল-ছল কল-কল করে পাহাড়ের বৃকের বন্দী জল ছাড়া পাবে।

সে এক দেখবার মতো ব্যাপার। কালো পাথর কুঁদে তৈরি করা একশো ছেলে-মেয়ে গাছের গুঁড়ি দিয়ে পাথর ঠেলে আর একটা মেয়ে গান ধরে—

ও বোঙা ! দেখছ নাকি চেয়ে ?

তোমার দোয়ায় মানুষ তোমার

একশো ছেলে মেয়ে !

মোদের ঘরের ভাঁড়ার খালি,

খালি মোদের হাতের ডালি !

বোঙা ছাড়া আর আমাদের

কোনো কেউটি নাই !

বোঙা মোদের মা-বাবা

বোঙা মোদের ভাই !

মেয়েটা গায় আর সবাই মিলে ঠেলা দেয়। দেখতে দেখতে দশটা উৎসের মুখ খুলে গেল। চাঁদপাহাড়ির গা বেয়ে পুরনো খাত দিয়ে বুড়ো নদী আবার ছুটল। যেখান দিয়ে যায়, দুই তীরের বালি চিকচিক করে।

এতক্ষণ পিয়াসোনা গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা পাহাড়-চুড়োয় হাত-পা এলিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। এবার মোড়লের গাঁয়ের

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলে বুড়োনদীর উৎস ঘিরে সেই দশটি গাছের গুঁড়ি পৌঁতা হ'ল। তাদের গোড়াতে নতুন বরনার জল ঢালা হল। পিয়া ওদের দলের পাণ্ডা। ছোট পণ্ডিত এসে তার কাছে কঁদে পড়েছিল। ছেলেমেয়েরা কাছ-ছাড়া হওয়াতে কালোবউ শয্যা নিয়েছে। খালি মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। কান্নাকাটি করে। রাঁধেও না, বাড়েও না, খায়ও না। তাই চব্বিশ ঘণ্টা না যেতে, নখের মতো চাঁদের আলোতে চুপিসাড়ে একেবারে একলাটি পিয়া বেরিয়ে পড়েছিল। তার আগে ছোট পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে কালোবউকে যা নয় তাই বলে বকেও এসেছে। বলে এসেছে, “স্বামী হল গিয়ে দেবতা। তার চেহারা যাই হক, তুমি তার রান্নাবান্না বন্ধ করেছ কী বলে ?” তাতে কালোবউ দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে খালি বলেছে, “ভাগ্ !” ওঠেওনি, রাঁধেওনি। ছোট পণ্ডিত ফলমূল ছানা এই সব খেয়েছে। “তোমরা বাপু চলো। জল ছাড়া হয়ে গেল। পিয়াসোনা গাঁও বেঁচে গেল। বালি আবার চিকচিক করছে।”

চলো বললেই তো চলা যায় না। ঐ দুশো ছেলেমেয়ে পাহাড়চুড়োয় কিলবিল করতে লাগল। সব আগাছা তুলে, শুকনো ঘাসপাতা পুঁতে, আলগা পাথর গুঁথে, তবে তাদের ছুটি হল। তারপর সবাই মিলে গান ধরল, “বোঙা ছাড়া আর আমাদের কোনো কেউটি নাই, বোঙা মোদের মা-বাবা, বোঙা মোদের ভাই।”

মোড়লের গাঁয়ের মা-দিদিমারা ছাগলের দুধের মিষ্টি ঘোল খাইয়ে, গলায় ফুলের মালা পরিয়ে, গাঁ খালি করে অনেক দূর পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিল। সঙ্গে দিল ছানামাখা, ফল, আমসত্ত্ব। পথে থিদে পেলে মুখে দেবে। গাঁয়ে একদানাও চাল নেই যে, অতিথিদের খাওয়াবে। মোড়ল বলল, “অতিথি কোথায়, ঠাকুমা ? ওরাও বোঙার চাকরের নিজের গাঁয়ের লোক। তাঁকে দেখলে আমাদের ভালবাসা দিও, বাছারা।”

যাবার সময়ে তাড়া ছিল, অঙ্ককার ছিল, চারদিকে চেয়ে দেখার সময় পায়নি কেউ। গাঁয়ের সকলে ফিরে গেলে, কিছুক্ষণ মন বড় খরাপ ছিল। তারপর নোনতা বলল, “তোরা কী করে হদিস পেলি ? পিয়া, তোকে না বলেছিলাম কুয়ো হবি। যা শুনবি মনের মধ্যখানে টুপ করে ডুবিয়ে দিবি। তা তোর নামতাই মনে থাকে না, তা আবার গোপন কথা !”

পিয়া বলল, “সব টুপ করে মনের পাঁতকোতে এমনি ডুবে যায় যে, নিজেও আর মনে করতে পারিনে। না নামতা, না অন্য কথা। ওদের মনে সদাই সন্দেহ। আমাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখে, একে একে কিনা সব কটা এসে জুটেছে ! খালি খুব ছোটগুলো আর যাদের পায়ে ব্যথা তারা ছাড়া। খোঁড়া ননেটাকে পর্যন্ত কাঁধে ঠেকো দিয়ে আনতে হল !”

ননে বলল, “হ্যাঁ, নইলে চাঁচিয়ে পাড়া মাত্ করতাম না ! আমি না থাকলে ওরা আরও আগেই হয়তো পৌঁছত।” এই বলে ননে একটু ফোঁত ফোঁত করে কঁদে নিল।

নোনতা বলল, “আহা, তাতে কী হয়েছে ! আমাদের সঙ্গেও তো তিত্তুকুটির মা আছে। দু' পা হাঁটলেই হাঁপ ধরে। মেয়েছেলের ঠাকুরদা !”

ততক্ষণে তিত্তুকুটির মায়ের কথা সবার কানে কানে পাচার হয়ে গেছে। ওরা হেসে বাঁচে না ! খালি তিত্তুকুটির মা রাগে ফোঁসফোঁস করতে করতে আরও বেশি খোনা গলায় বলল, “ন্যাকা ! ঢং !”

ছেলেমেয়েরা তাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টায় বলল, “বলো না, কী করে তোমার দাদামশাই হাঙরের হাত থেকে বেঁচেছিল। তাড়াতাড়ি বলো, গাঁয়ের খোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি। খুব দূরে নেই।”

তিতুকুটির মা ধপ করে পথের ধারে মাটির টিবির ওপর ধেবড়ে বসে পড়ে বলল, “তাইলে একটু বঁসতে ইঁল। বঁড্ড পা কঁনকন কঁরে। তিনপুরুষ নোনা জঁলে ডুবুরির কাঁজ কঁরেছে তো। টাঁকাকড়ি কিছু দিয়ে যায়নি, খাঁলি ওইটে দিয়েছে। তঁই বা কঁে দেয়, বল।”

ওরা বলল, “বাজে কথা রাখো মা, গল্পো বলো, গল্পো বলো, গল্পো বলো।”

॥ সাত ॥

তিতুকুটির মা অসম্ভব ভাল গল্প বলে। সে বলে, —(সব চন্দ্রবিন্দু বাদ দিয়ে বলা হচ্ছে কিন্তু। চন্দ্রবিন্দুতে কী হবে আঁ ?) “আমি মালগাড়ি ভাঙাদের সঙ্গে জুটে জেলে গেলেও পুরলিয়ায় বাপ-পিতেমোরা আর চিন্তা ছাড়িয়ে যে অন্য বহরমপুর আছে সেখানে আমার মামার বাড়ির লোকরা চোদ্দ পুরুষ ধরে যেসব অসম্ভব সাহসের কাজ করে এসেছে, তা শুনলে তাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবে। আমারই নাহয় খরগোশ দেখলে পেটের মধ্যখানে ধড়ফড় করে। সে তো ছোটবেলায় প্রজাপতিতে কামড়েছিল বলে। কী রক্ত—কী রক্ত—!”

সোনা বলল, “বাজে কথা রাখো মা, আসল গল্প বলে। চোদ্দ পুরুষের আগে ওরা সব কী করত ?”

তিতুকুটির মা অবাক হল, “ও মা ! চোদ্দ পুরুষ আগে তো সবাই বাঁদর ছিল। পণ্ডিত তাদের পড়ায়নি ?”

“আচ্ছা, আচ্ছা, তাই। তাল্লর তোমার মামাদের কী হল ?”

“তা পরানে ওদের ভয়ডর ছিলনি। ভোর না হতে ভাঁটার সঙ্গে নৌকো ঠেলে বেরিয়ে পড়ত। ড্যাঙা থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই সব আশ্চর্য জিনিস জালে পড়ে। ডুবুরিরা সমুদ্রের তলা থেকে বড়-বড় রামধনু রঙের শামুক ঝিনুক তুলে আনত। কী দাম তাদের। একেকটার মধ্যখান থেকে মুক্তো বেরত। মাদুলি করে হাতে বাঁধলে তার কোনো বিপদ-আপদ হয় না। সুখে থাকত ওরা, পয়সাকড়ির জন্য ভাবতে হত না। তাজা মাছ খেয়ে কী সব শরিল। মেয়েগুলো পর্যন্ত তালঢ্যাঙা !”

কটা মুচকি হেসে বলল, “সে তো তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এত ঢ্যাঙা মেয়েমানুষ এদিকে হয় না। কিন্তু সে-জায়গা ছেড়ে এখানে এল কেন তোমার দাদামশাইরা ?”

তিতুকুটির মা বলল, “এসেছিল কি সাধে ? মনের দুঃখে চলে আসতে হল। চুপ করে বসিস্ তো বলি।”

গাঁয়ের একশো ছেলেমেয়ে তিতুকুটির মায়ের পায়ের কাছে জড়ো হয়ে বসে পড়ল। ঘোমটার ফাঁক দিয়েও বুড়ির গলার আওয়াজ জোরে শোনাতে লাগল।

“পরানে ভয়ডর নেই কথাটা ভুল বলেছি ; ভয় একটা ছিল। ড্যাঙার কাছে পৌঁছে যেখানে ঢেউ ভাঙত, সেখানে কারও কারও হাত-পা ভাঙলেও, আসল ভয় আরও দূরে, সমুদ্রের সবুজ জল যেখানে নীল বরন ধরে। সেখানে রক্তের গন্ধ পেলেই তিনকোনা পাখনা তুলে জলদানোরা ভেসে ওঠে। তারা হল হাঙর। বিকট জানোয়ার তারা, নিজেদের কারও গায়ে রক্ত দেখলে তাকে সুদ্ধু ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। তাদের

ভয়ে ডুবুরিরা একরকম তেল মেখে তবে ডুব দেয়।

“তা আমার দাদামশায়ের বাবা কখনও বেশি দূর যেত না, ডুব তো দিতই না। ডুব দিতে শিখতে হয়। বুড়োদাদু তার তিন স্যাঙাতকে নিয়ে তিনবার জাল ফেলে যা পেত, তাই নিয়ে জোয়ারের ঢেউয়ের মাথায় নৌকো ভাসিয়ে ফিরে আসত। জোয়ার নিজেই তাদের নৌকোটাকে বালির ওপর নামিয়ে দিয়ে ঝড়ের মতো শব্দ তুলে, ফেনা ছিটিয়ে ফিরে যেত। বুড়োদাদুরা লাফিয়ে পড়ে নৌকো টেনে আরও উঁচুতে উপুড় করে ফেলত। বাড়ির ছেলেরা এসে হাত লাগাত। তাদের মধ্যে আমার দাদামশায়ও ছিল। বড় বড় ভাল মাছ বাজারে বিক্রি হত, কিন্তু অদ্ভুত চেহারার না-মাছ না-জানোয়ার আর নানারকম ছোট মাছ ঘরে এনে রান্না হত। তার মধ্যে মাঝে-মাঝে জলদানোর ছোট্ট-ছোট্ট ছানাও অন্য মাছের সঙ্গে মরে থাকত। খেতেও ভাল।

“একদিন মেঘ করেছে। তাড়াতাড়ি মাছ ভাগ হচ্ছে, দশ বছরের দাদামশাই দেখছে। এমনি সময় রূপোর মতো চকচকে ছোট্ট একটা মাছ ঝাঁপ দিয়ে দাদামশায়ের পায়ের ওপর পড়ে, আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। ভাজলে হয়তো দুটো গরাসও হবে না। দাদামশাই তাকে টুপ করে তুলে, কোঁচড়ে ঠুঁজে ফেলে আস্তে আস্তে আধা অঙ্ককারে সরে পড়ল। দাদামশাইদের কুঁড়ের পাশেই কালো কালো পাথরের চাঁই, তার মধ্যখানে একটুখানি নোনা জল ফাটল চুঁয়ে জমা হয়ে থাকে। সেখানে দাদামশাই সমুদ্রের আগাছা লাগিয়ে বাগান করেছিল, ছোট ছোট সুন্দর মাছ ছেঁড়েছিল। নিজেদের এলাকা, বাইরের কেউ জানত না। সেই জলে মাছটাকে ছেঁড়ে দিয়ে এল দাদু। জলে পড়েই তার কী ফুর্তি, লাটুপাটু ডিগবাজি খেতে লাগল। দাদামশাই সকালে উঠে দৌড়ে গিয়ে দেখে বাগানের সব সুন্দর মাছ খেয়ে সাবাড় করে খুদে মাছটা আনন্দে তার ছোট্ট তিনকোনা পাখনা তুলে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। দাদুর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। কিন্তু জলে তার ছায়া পড়তেই খুদে মাছ সাঁতরে কাছে এসে তার মুখের দিকে এমন করে চেয়ে রইল যে, দাদু তাকে ভালবেসে ফেলল।

“তাতেই তার কাল হল। মাছের নাম রাখল পান্না। আঁস্তাকুড়ের পাশে বলে জায়গাটা নিরাপদ, কেউ তার ধারকাছেও যায় না। দাদু মাছকে শামুক, গুগলি, অন্য ছোট মাছ, জ্যাস্ত ইঁদুর, ব্যাঙ, ছুঁচো খাইয়ে খাইয়ে হদ্দ হয়ে যেত। কিন্তু মাছটাও দাদুকে ভালবাসত। জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দিলে কাছে এসে নাক ঘষত। নাকের পাশে একটা পুরনো কাটার দাগ ছিল। নীচের মেডেতে দু’সারি দাঁত। তার মধ্যখানের কয়েকটা ভাঙা। ওর মুখটা দাদুর চোখে বড়ই চেনা হয়ে গেছিল। কিন্তু মাছ ক্রমে বড় হয়, আরও বেশি খাবার দরকার, ঐটুকু জলে আঁটেও না। শেষটা একটা জোছনা রাতে নৌকো করে তাকে নিয়ে তিনটে ঢেউ ভাঙার লাইন পেরিয়ে নীল গভীর জলে ছেঁড়ে দিয়ে দাদু ফিরে গেল। প্রথমটা দুঃখ হত, পরে দাদু তাকে একরকম ভুলেই গেল।

“তারপর এক সময় দাদু কুড়ি বছরের জোয়ান হয়ে উঠল ; ডুবুরির কাজ শিখল। তাদের অনেক বেশি রোজগার। ছোটবেলার বন্ধু ফানাও তার সঙ্গে আছে। একবার কী হল, ফানা ওপরে নৌকোয় বসে। দাদু ডুব দিয়ে একটা ঝিনুক তুলেছে। তাই দেখেই ফানার বড় লোভ হয়েছে ; ঝিনুক তার

চাই, ওতে মুক্তো থাকে। দাদু হঠাৎ চটে গিয়ে, বিনুকটাকে ছুড়ে জলে ফেলে দিল। ফানাও রাগে অন্ধ হয়ে, বিনুক খোলার বাঁকা ছুরিটা দাদুর ঘাড়ে বসিয়ে দিয়ে, তাকে ঠেলে জলে ফেলে দিল। টুপ করে ডুবে গেল দাদু। ছুরিটা বেশি ভিতরে ঢোকেনি, জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খসে গেল। চারদিকে লাল পালকের মতো রক্ত ছড়িয়ে পড়ল। একটু পরেই তিনটে কালো ছায়া দেখা গেল। হাঙর এসেছে রক্তের গন্ধ পেয়ে! মেরেই ফেলত তারা দাদুকে। হঠাৎ তাদেরই মধ্যে একটা হাঙর কাছে এসে দাদুর গায়ে নাক ঘষতে লাগল। পান্না! ততক্ষণে সবাই ভেসে উঠেছে। তারপর কী যে হল, দাদু ঠিক বলতে পারত না। ও যে পান্না, তাতে সন্দেহ নেই। সেই ভাঙা দাঁত, নাকের পাশে দাগ। তারপর অন্য দুটোর সঙ্গে তার যে কী তুমুল ঝটপটি লেগে গেল! আরও হাঙর জুটল। দাদুর চোখের সামনে পান্নার গা থেকে তারা মাংস ছিঁড়ে ফেলতে লাগল! দাদু চোখে অন্ধকার দেখছিল। এমনি সময় কেউ তাকে টেনে নৌকায় তুলে নিল। ফানা! রাগ পড়ে যেতেই ফানা ফিরে এসেছিল। আর দাদু কোনোদিনও সমুদ্রেরে যায়নি। বহরমপুরে বিনুকের গয়না তৈরি করত।”

গল্প শেষ করে তিতকুটির মা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। ছেলেমেয়েরাও বোবা। তারা কখনও সমুদ্র দেখেনি, তবু মনে হচ্ছিল বুঝি কোনোদিন দেখেছে। শেষটা তিতকুটির মা-ই উঠে পড়ে বলল, “অন্ধকার হয়ে গেছে। বাঁড়ি যা রে তোরা।”

এতক্ষণে সকলের সম্বন্ধে ফিরে এল। তাই তো! বাড়ি যেতে হবে তো। যে কাজের জন্যে তারা বেরিয়েছিল, তা হয়েছে। সাতটা ছেলেমেয়েকে সঙ্গে করে সবাই ফিরেছে। আবার সবাই পাঠশালায় যাবে, ছোট পণ্ডিত বই খুলবে, মা-বাবারা নিশ্চিন্ত হবে। সাতটা ছেলেমেয়েও চমকে উঠল। তাই তো! সব কাজ তো হল না! পিয়াসোনার মুখ খুলেছে। এখান থেকে শোনা যাচ্ছে কুলকুল কলকল। বালিও নিশ্চয় চিকচিক করছে। কিন্তু তিতকুটির মায়ের কী গতি হবে? বুড়োনদীর পাশের গাঁয়ের মোড়ল বলেছিল, “মা ঠাকরুন, হেথায় থাকো। আমাদের মুখ্য মেয়েদের একটু সিলাই-ফৌড়াই, পিঠে-পুলি শিখিয়ে দাও। আমরা মাথায় করে রাখব! আমার মা মরেছে ত্রিশ সাল হল! তুমি আমাদের মা হও।” এরা সাতজন হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায়নি! তা, তিতকুটির মা কেঁদেকেটে ওদের সঙ্গে ফিরে এসেছে। এখন পুলিশ-পেয়াদারা গন্ধ পেলেই তো হয়ে গেল!

যেমন ভাবা অমনি সব্বনাশ। চারদিক থেকে বিজলি টর্চ জ্বলে কম করে পঞ্চাশজন থানার লোক ওদের ঘেরাও করে ফেলল! তবে ওরাও তেমনি একশো মাথা। ফুস-ফুস করে ছোটগুলো সব নিঃশব্দে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়ে, যে যার বাড়িতে সৈদুল! পুলিশের সঙ্গে হরবিলাসকাকাও ছিল। তার রাগ দেখে কে! যেন পুলিশের বাবা! “খুঁজে দ্যাখো, আছে এদের মধ্যে সেই মালগাড়ি-ভাঙা গুণ্ডা। মেয়েমানুষ সেজে আছে। বলাইদার ছোট গোয়ালের তাকে একটা উকো, একটা ভাঙা লোহার বেড়ি আর ছেঁড়া নীল পেটেনলুন পাওয়া গেছে। বৌদিদির কাচা শাড়ি দড়ি থেকে হাওয়া! আরে আরে, ওই তো! ওই তো! ধর্ ধর্ ধর্!”

পঞ্চাশটা টর্চের আলো একসঙ্গে তিতকুটির মার মুখে।



॥ আট ॥

যেই না মুখে পঞ্চাশটা আলো ঝলমলিয়ে উঠল, সবাই ভাবল এবার নিশ্চয় তিতকুটির মা হাত-পা এলিয়ে মুছো যাবে! হল তার উল্টোটি। তিতকুটির মার চেহারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া বদলে গেল। টান হয়ে সে উঠে দাঁড়াল। টর্চবাতির আলোতে তাকে মনে হল সবার মাথার ওপর লম্বা। একটা পুলিশ ছোট্ট একটা বন্দুক উঁচিয়ে, ঠিক সেই মেলার মাঠের বাইস্কোপের টিকটিকির মতো বলল, “কিষ্ট জনার্দন! সশস্ত্রভাবে মালগাড়ি ভাঙার জন্য আমি তোমাকে গেরেপ্তার করলাম।”

পিয়া তাই শুনে সরু গলায় চ্যাঁচাতে লাগল, “ওরে তোরা চলে আয়! প্যায়দাবাবু লাটক করছে দেখবি আয়!”

অমনি যারা পালিয়ে গেছিল, তারা সব তো দুদাড় করে ফিরে এসে ভিড় বাড়ালই, মায় তাদের মা-বাবারাও এল। খোলা আকাশের তলায় রাতে লাটক দেখতে কার না ভাল লাগে!

সেই পুলিশের লোকটা ওই কথা বলেই তড়বড়িয়ে এগিয়ে এসে তিতকুটির মার বাঁ কাঁধে হাত রাখল। অমনি তিতকুটির মা চিড়বিড়িয়ে উঠে, এক ঝাঁকি দিয়ে কাঁধ থেকে হাতটা ফেলে, মাথা থেকে ঘোমটা ফেলে, দু' পা এগিয়ে তার গালে টেনে এক চড় কষিয়ে বলল, “তঁবে রে ডাক্তার! ঝাঁপিয়ে! মেয়েমানুষের গায়ে হাত ঝুলতে নাজ্জা লীগে না!”

পুলিশের হাত থেকে বন্দুক পড়ে গেল। জোরে একটা নিশ্বাস ছেড়ে, চারদিকে তাকাল তিতকুটির মা। সবাই দেখে থ'! ও মা! এ তো তিতকুটির মা নয়, এ যে তাদের সেই



হাত বাড়ালেই ভূত

ভূতেরা কোথায় থাকে ?

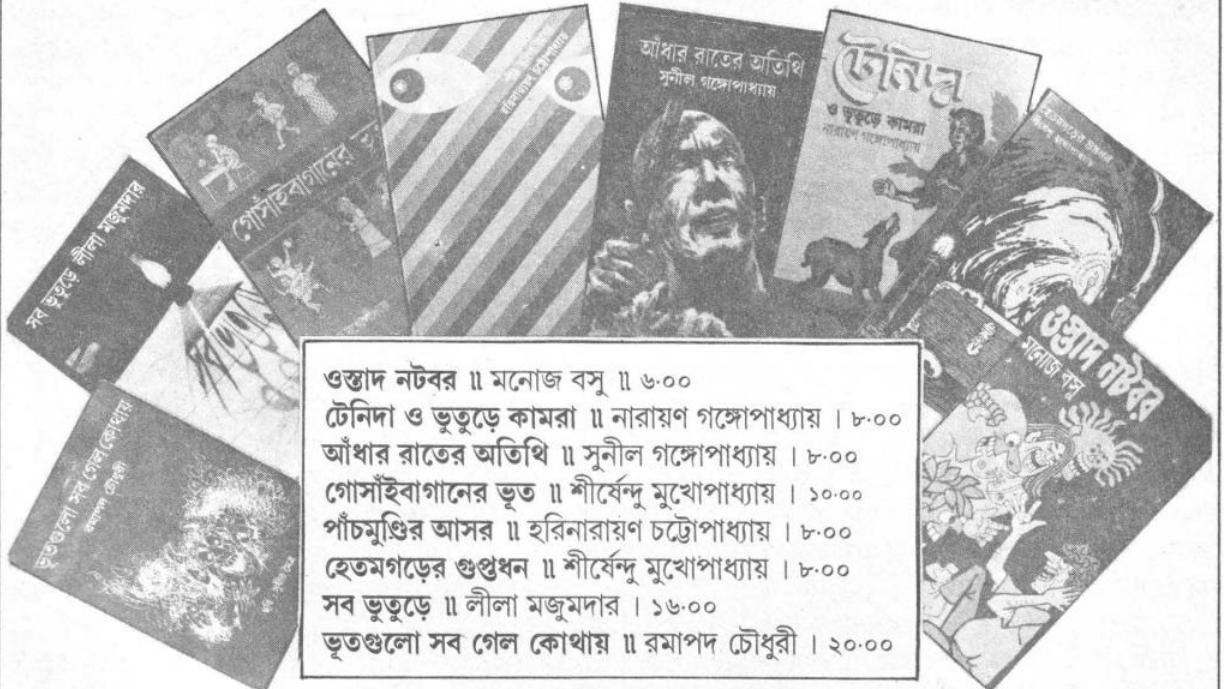
এর উত্তরে ভূত-বিশ্বাসীরা কী বলবে বলো তো ? বরং তারা উণ্টো প্রশ্ন করবে, ভূতেরা কোথায় না থাকে ? সত্যি বলতে কী, তর্ক করে এর কোনো মীমাংসা হবে না।

কিন্তু একটা কথা সঙ্কলে স্বীকার করবে—সে তারা ভূতে বিশ্বাসী হোক, কিংবা হোক ভূতে অবিশ্বাসী—যে, একটা জায়গায় হাত বাড়ালেই ভূতের দেখা পাওয়া যায়।

কোন জায়গা জানো ?

জায়গাটা হল, বইয়ের তাক।

হ্যাঁ, বইয়ের তাকেই ভূত রয়েছে। শুধু একটু কাছে ডেকে নেওয়া। তাহলেই দেখবে, কেমন সুড়সুড় করে নানা ধরনের ভূত এসে ঠিক হাজির হবে। কেউ-বা আলেয়াভূত, কেউ-বা পাখিভূত, কেউ-কেউ ব্রহ্মদত্তি। কেউ নিপাট ভালমানুষ, কেউ খুব দুষ্টি। কোনো ভূত যদি অঙ্ক কষে দেয়, কোনো ভূত ঝুঁজে দেয় গুপ্তধন। আর এইসব নানান ধরনের নানান চেহারার নানান চরিত্রের ভূতেরা যেসব বইতে রয়েছে সেইসব বইয়ের নামগুলো তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি।



ওস্তাদ নটবর ॥ মনোজ বসু ॥ ৬০০

টেনিদা ও ভূতুড়ে কামরা ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । ৮০০

আঁধার রাতের অতিথি ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । ৮০০

গোসাঁইবাগানের ভূত ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় । ১০০০

পাঁচমুণ্ডির আসর ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় । ৮০০

হেতমগড়ের গুপ্তধন ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় । ৮০০

সব ভূতুড়ে ॥ লীলা মজুমদার । ১৬০০

ভূতগুলো সব গেল কোথায় ॥ রমাপদ চৌধুরী । ২০০০



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

চিরচেনা কালোবউ ! দু' হাত তুলে চারদিকে হাতড়াচ্ছে ! কাকে যেন খুঁজছে ! যাদের খুঁজছিল, তারা সাতজন সঙ্গে সঙ্গে, সাত দিক থেকে কালোবউয়ের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মা, মা, মা, মা, মা, মা, মা ! টর্চবাতির আলোয় সবাই দেখল, এই তো সত্যিই তাদের চিরচেনা কালোবউ ! আঁ ! সেই উটকপালে, উঁচু-দাঁত কালোবউ ! তার গলা ধরে ফুলের মতো সুন্দর সাতটা ছেলেমেয়ে ঝুলে আছে, আর কালোবউকে দেখাচ্ছে যেন রূপের ডালি ! এ-ও কী করে সম্ভব হল ! এত রূপ কোথায় ছিল ?

পুলিশের বাবুটিও ততক্ষণে কালোবউয়ের পায়ে পড়েছে, “মা, আমাদের ক্ষমা করুন। ভুল খপর পেয়ে আমি আপনাকে অপমান করেছি !” কালোবউ নিচু হয়ে তাকে টেনে তুলে বলল, “ষাঁট ষাঁট ! ও কি কথা ! তুমি আমার সইয়ের বৌনপো অনিমিষের দাঁদা অজ্ঞানেশ না ? তৌমার লক্ষ বছর পরমাই হক। কিন্তু বাছা, অমন করে খেলার বন্দুক উঁচিয়ে বড়োমানুষদের ভয় দেখাতে হয় না !”

সবাই বলল, “ছি ! ছি !”

লজ্জায় অজ্ঞানেশ মুখ ঢাকল। কে যেন বলল, “কাজটা খারাপ। তবে ওটা সত্যিকার বন্দুক।”

এমনি সময় আর সইতে না পেয়ে, গলায় ঝোলা ছেলেপুলে সুদু কালোবউ হাত-পা এলিয়ে মুছো গেল। ভিড়ের মধ্যে পুলিশবদ্যিও ছিলেন। তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখে টর্চ নিবিয়ে পুলিশের লোকরাও চলে যাচ্ছিল। কোথা থেকে বড় পণ্ডিত দেখা দিয়ে হুংকার ছাড়লেন, “ও কী হচ্ছে হতভাগারা ! সব্বনাশটি পাকিয়ে চারদিক আঁধার করে কেটে পড়ছিস ! বদ্যিমশাই রুগি দেখবেন। আলো দেখাতে হবে না !”

টর্চগুলো আবার জ্বালা হল। কিন্তু পুলিশবদ্যি কিসের একটা পাতা নিয়ে এগিয়ে আসার আগেই, ছেলেমেয়েগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, কালোবউ উঠে বসে, মাথায় আবার ঘোমটা টেনে বলল, “ও মা ! বউঠাকুর যে ! কী নজ্জা ! কিন্তু মুছো গেলাম কোথায় ! সাতটে ধুমসো ছেলেমেয়ে ঝুলে পড়লে না-পড়ে করি কী !” এই বলে সাতটাকে একসঙ্গে বৃকে জাপটাবার চেষ্টা করতে লাগল !

তারা সব তাজ্জব বনে গেছিল। এই তো দুদিন আগে কেষ্টকে মওড়া দিয়ে তিতকুটির মা সাজিয়ে, সঙ্গে নিয়ে গেল, আর এরই মধ্যে সে সত্যি-সত্যি তাদের সেই পুরনো মা বনে গেল ! এটা কী করে হতে পারে ! ততক্ষণে ছেলেমেয়েরা কালোবউকে ধরাধরি করে ছোট পণ্ডিতের বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছে। পুলিশের লোকরা চলে গেলেও, পাড়ার লোকরা কেউ কেউ সঙ্গে চলেছে। তাদের বড় কৌতূহল, কালোবউ যদি ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই গেল, তাহলে এ দুদিন তার খাটে শুয়ে কেঁদে ভাসালটা কে ?

শুনে বড় ঠাকুর যেন আকাশ থেকে পড়লেন। “ও মা ! সে আবার কী রকম কথা ! ও আমার সেই ঝগড়াটি দিদি ছাড়া আবার কে ! ভালমানুষ স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে ছোট পণ্ডিতের কাছে হাজির ! তা বউ বাড়ি নেই, ছোট বলে, তুমি রাঁধো ! দিদির কী রাগ ! বাঁধবেই যদি তো বড়োটাকে ছেড়ে এল কেন। এখন তাকে আমার আশ্রমেই নিয়ে যাই। দিন কতক থাকলে মাথা আপনি ঠাণ্ডা হবে।”

সবাইকে বিদায় দেবার আগে বড় ঠাকুর তাদের

বদরীনারায়ণের প্রসাদ দিলেন। একটা করে বাতাসা, চারটি কিসমিস। সবাই কেতাখ হল। বড়ো বললেন, “বলিনি ঐ সাতটি ছেলেমেয়েকে যত্ন করে পালবে। ওরা তোমাদের দুঃখ ঘুচাবে। তা তোমরা করলে কোথায় ? দূর ছাই বলে জন-মজুর খাটালে ! কী সব বিচ্ছিরি নাম রাখলে, ছিঃ ! ভাগ্যিস তোমাদের ছেলেমেয়েগুলো ছিঃ দেখলে তো ওরা পিয়াসোনা নদীকে আবার কেমন বই। আবার দ্যাখো চিক্‌চিকে বালি। ওদের মাথায় করে রাঃ হয়। তোরা ওদের তাড়িয়ে দিলি, আঁ ?”

তারা কেঁদে বলল, “বড় ঠাকুর, তুমি না থাকলে আমাদের বুদ্ধিভ্রম হয়। কী করতে কী করি তার ঠিক নেই। বোঙার থানে গেলে, তা বোঙাকে আমাদের কথাও কিছু বলতে পারতে, বড় ঠাকুর !”

বড় পণ্ডিত বললেন, “তার সঙ্গে কথা বলা অত সহজ নয় রে। খালি মনে হল যেন একবার দেখতে পেলাম। পাহাড়ের সাদা চূড়ায়, মেঘের আড়ালে। কী সুন্দর ! কী সুন্দর ! তোরাও দেখে আসিস্ গে। বোঙা কেন আসবে ? তোদের ছেলেমেয়ে ঘর ছেড়ে ওদের খুঁজতে বেরুলে, তোরাই না পেয়াদা ডেকে আনলি ? রাম, রাম !”

ততক্ষণে ঘরে ঢুকে কালোবউ খাটে-শোয়া মানুষটার চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামিয়েছে। “রাঁধিসনি কেন, কেঁটা ?”

কেষ্ট বলল, “উঃ ! লাগে না বুঝি, না ? রাঁধবেই যদি তো জেলখানা কী দোষ করেছিল ! ওদের সঙ্গে যেতে দিলে না কেন ?”

“অ্যাঁ, চূপ, চূপ !” বলে নোনতা ওর মুখ চেপে ধরল। কালোবউ বলল, “আমার যমজ ভাই, আমি তোকে হাড়ে-হাড়ে চিনি ! বড় ঠাকুরের কাছে গিয়ে ভাল হয়ে থাকবি, বুঝলি ?”

পরদিন ভোরে কেষ্টার খোঁচা দাড়িসুদু গালে একটা চুমু খেয়ে, ‘দুগুগা দুগুগা’ বলে কালোবউ তাকে বড় পণ্ডিতের সঙ্গে রওনা করে দিয়েছিল। বড় ঠাকুরও থানার সামনে দিয়ে বড় বড় পা ফেলে দিদিকে নিয়ে উত্তরুর পথ ধরলেন। সবাই তাই দেখে প্রণাম জানাল। “আবার এসো ঠাকুর, নইলে আমাদের পথ দেখাবে কে ?”

সকালে পাঠশালা ঝাঁটপাট দিয়ে, হেঁসেলের সামনে পাতকো থেকে জল তুলে দিয়ে, সাতটাতে যখন গুড়মুড়ি নারকেলকোরা পাকা কলা দিয়ে জলখাবার করতে বসেছে, ছোট পণ্ডিত এসে বলল, “পঞ্চায়েত থেকে পাঠশালার গুরুর বাড়িতে রোজ তিন বেলা সিধের ব্যবস্থা হয়েছে। খেয়ে উঠে পড়তে বসবি সবাই। আর দ্যাখ, তাদের মা-বাবার খোঁজ পায়নি বড়দা। বানেই ভেসে গিয়ে থাকবে। হয়তো উত্তরদেশের তীর্থযাত্রী। দুঃখ করিসনে, বরং পড়াশুনোয় মন দে।”

শুনে ওরা সাতজন হাঁ। মা-বাবা ? এই তো মা-বাবা। মানুষের ছেলেমেয়েদের আবার ক’টা মা-বাবা লাগে ? মেয়ে দুটো এঁটো হাতে কালোবউকে জড়িয়ে ধরে। ছেলে পাঁচটে মুচকি হাসে। তোমরা দেখে আসতে পারো গিয়ে পিয়াসোনার কালো বউয়ের সাতটা সুন্দর ছেলেমেয়ে। তবে অন্য নামের গ্রামে।

ছবি : দেবাশিস দেব



রোভার্স বনাম মেলবরো।
চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দল।
রোভার্স ২-১ এগিয়ে
আছে। রয়কে বিদ্রূপ
করেছিল মেলবরোর কোচ
জ্যাকসন। তার এখন
মুখচুন!

জ্যাকো বদলি-স্টাইকার
নামাচ্ছে!

কী বলছে
জ্যাকো?

খেলার ছক
পাল্টাবে!

5



জ্যাকো খেপে গেছে ...

গোল দিতে পারলে দশ
হাজার টাকা দেব, বুঝলে?
রোভার্স যেন কিছুতেই না
যেতে!

দেখি!



রোভার্সের উপরে চাপ ক্রমে
বাড়ছে ...

চার্লি বাঁচিয়ে
দিয়েছে!

আর-একটু
হলেই
গোল হত!



রয়ের পায়ের
বল ...



বাইরে মেরে দাও, রয়!

কিন্তু ...

রয় কিন্তু বল পাঠাল ...

প্যাকো ডিয়াজ?

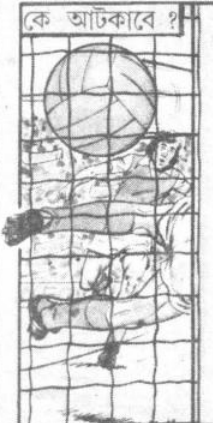


মেলবরোর ডিফেন্ডাররা প্যাকোকে কুখতে
ছুটে আসছে ...

ব্র্যাকি ধোঁকা দিয়েছে ... প্যাকো
এগোচ্ছে?
আটকাও!



কে আটকাবে?



যাঃ!

বাঁকানো শট!

গো-ও-ও-ও-ল!



মেলবরো বিমুদ ... সেই সুযোগে আবার হানা দিয়েছে
রোভার্স, এবং ...



রোভার্সের ভক্তরাও এতটা আশা করেনি!

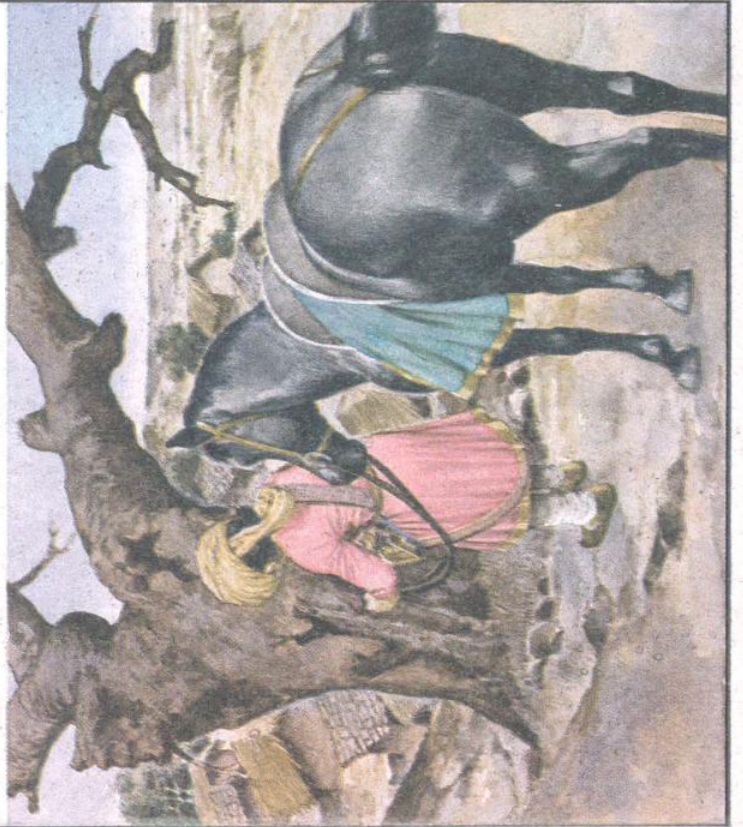


পরের খেলা কার সঙ্গে? তাতে ফল কী হবে?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



দুর্গ তার গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় একটা পাতা-বরা গাছ ।
তার শুকনো ডালে সদাশিব ঘোড়া বাঁধল ।



তারপর একটা পাথরের চাঙড়ের ওপরে
বসে ভাবতে লাগল—এখন কী করা যায় !



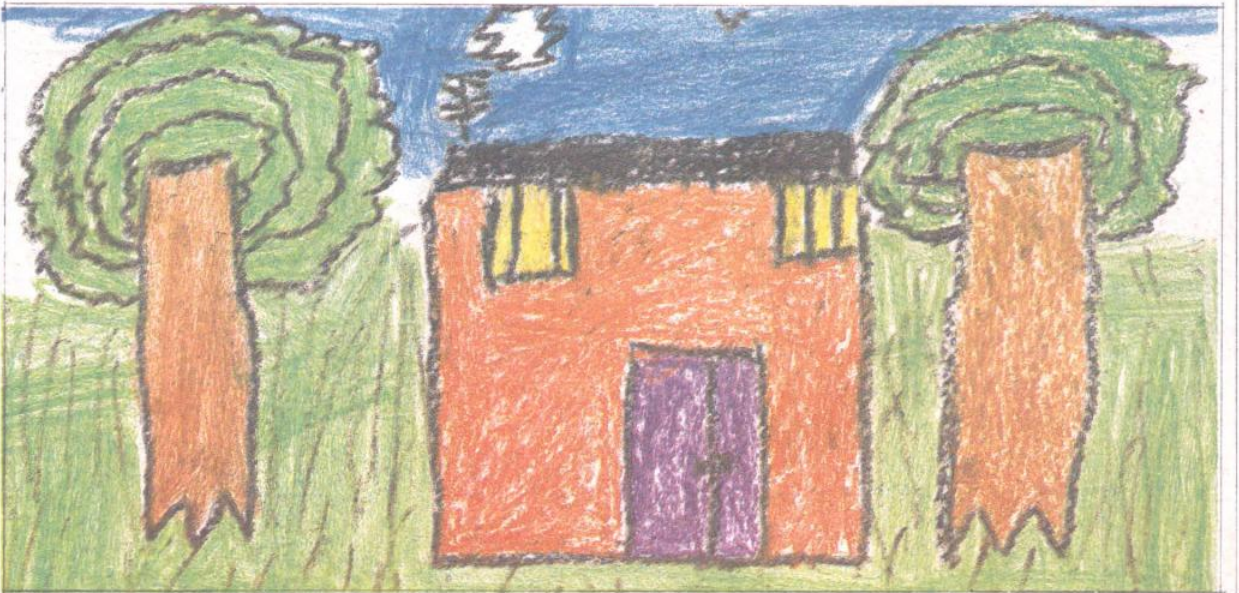
ওদিকে, পাশের গাঁয়ে



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



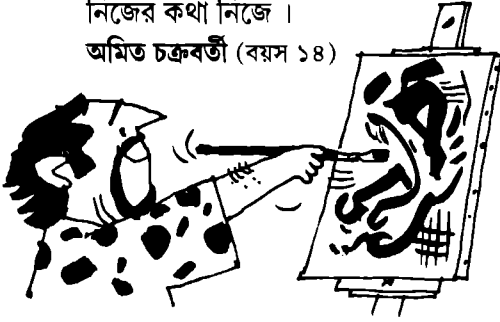
ছবি এঁকেছে উপমন্যু ভট্টাচার্য (বয়স ১৩)



ছবি এঁকেছে মহুয়া চক্রবর্তী (বয়স ৬)

এবার ভাবতে হবে

দাদু অনেক পদ্য লেখেন
সবাই বলে কবি,
বাবা হলেন আর্টিস্ট
তিনি আঁকেন বহু ছবি ।
ছোট্টকা হল পাইলট
সে এরোপ্লেনে ওড়ে,
মায়ের কাজে নেইকো ফাঁকি
হাজারটা কাজ ঘরে ।
ফুটবলেতে নাম করেছেন
আমার ছোটমামা,
দাদা যাবে আমেরিকা
চিলি বা পানামা !
বড় হয়ে আমি হব
গায়ক-নায়ক কী যে ?
এবার আমায় ভাবতে হবে
নিজের কথা নিজে ।
অমিত চক্রবর্তী (বয়স ১৪)

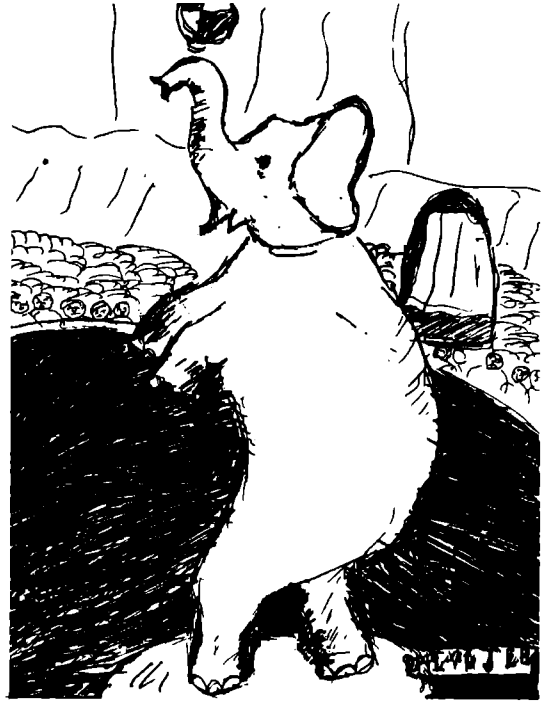


ফসিল

কোটি-কোটি বছর আগে
ইতিহাস যেখানে পারেনি পৌঁছুতে—
সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে
কোনো এক জীবদেহ মাঝে
ছিলে তুমি ।
সেই জীবের সাথে
ঘুরে বেড়াতে তুমি পৃথিবীতে
লাঞ্ছিত হত তার পদচিহ্নে—
কত প্রান্তর বনভূমি ।
সেই অনাদি অতীতে,
তুমি যার মধ্যে ছিলে,
সে হয়তো ছিল পৃথিবীর সম্রাট—
হায় ! প্রকৃতির কী নিষ্ঠুর পরিহাস !
সেই সম্রাটের প্রতীকরূপে
আজ তুমি পড়ে আছ
কলকাতার মিউজিয়ামে—
তোমার মাঝে প্রতিবিস্তৃত হচ্ছে
রহস্যঘেরা অনাদি অতীত
হে ফসিল ।
কৌশিক চট্টোপাধ্যায় (বয়স ১৬)

চিড়িয়াখানায়

আকাশ দিয়ে হাজার-হাজার
উড়ছে পাখি,
শীতের ভোরে চিড়িয়াখানায়
যাচ্ছে নাকি ?
যাচ্ছি মোরা চিড়িয়াখানায়
চাদর মুড়ে—
হাতি ঘোড়া কুমিরছানা
দেখব ঘুরে ।
জ্যোতির্ময়লাল মাইতি (বয়স ৬)



ছবি ঐকেকে শিবাজি ঘোষ (বয়স ১০)

চডুইভাতি, আর

শীতের মাসেই চডুইভাতি
সার্কাস, বইমেলা
হালুম বাঘের ডাক শুনে
কাটবে শীতের বেলা ।
পূর্ণিমা দে (বয়স ৭)



সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের প্রধানশিক্ষক কী বলেন

সাদর্শতাকীর ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল বাংলাদেশের বহু যুগন্ধর প্রতিভার স্মৃতি বহন করছে। ১৮২৪ সালে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। অবশ্য তখন সংস্কৃত কলেজের অঙ্গ হিসেবেই ছিল এর অস্তিত্ব। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরেই এর পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। এই বিদ্যালয়েই একদিন বাবার হাত ধরে বিদ্যার্জন মানসে পদার্পণ করেছিলেন ভাবীকালের 'বিদ্যাসাগর' ঈশ্বরচন্দ্র। প্রধান শিক্ষক শ্রীসুজিতরঞ্জন দাসের নিজের বিষয় বাংলা ও অঙ্ক। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা পঁচিশ বছরের। ১৯৮০ সাল থেকে এই বিদ্যালয়ে আছেন। তিনি জানানেন, প্রতি বছর এখান থেকে গড়ে ৪০ জন ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। তার মধ্যে শতকরা ৫০ জনই প্রথম বিভাগে পাশ করে।

“মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে কীভাবে পড়াশোনা করা দরকার,” এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীদাস জানানেন, “এখনকার বেশিরভাগ ছাত্রই পড়ে কম। যা সিলেবাস, তাতে বোধহয় গভীরতার থেকেও পল্লবগ্রাহিতা আপাতদৃষ্টিতে বেশি কার্যকরী। তাই সুপরিকল্পিতভাবে সব বিষয়ের উপর সমান নজর দিয়ে পড়া উচিত। দ্রুতগতিতে ‘টু দা পয়েন্ট’ উত্তর লেখার উপরেই এখন ভাল নম্বর নির্ভর করে। সেজন্য স্কুলপাঠ্য বইগুলো আগাগোড়া খুব ভাল করে খুঁটিয়ে পড়া দরকার। প্রয়োজনবোধে শিক্ষকের নির্দেশমতো সহায়ক পুস্তকের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।”

বাংলা পড়া সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল, “বাংলা মাতৃভাষা। আর সেইজন্যই অবহেলা না করে ভাষাটা শেখার চেষ্টা করা প্রত্যেক ছাত্রের অবশ্য কর্তব্য।



টেক্সট বই খুঁটিয়ে পড়তে হবে। ব্যাকরণে অভ্যাসের মাধ্যমে দক্ষতা আনা চাই। প্রশ্নের দাঁচ অনুযায়ী উত্তর লেখা রপ্ত করতে হবে।”

ইংরেজি পড়া সম্পর্কে তিনি জানানেন, “শুদ্ধ ইংরেজি লিখতে পারলেই মাধ্যমিক স্তরে মোটামুটি ভাল নম্বর উঠতে পারে। ইংরেজি কমপোজিশন অংশ লিখে লিখে আয়ত্ত করতে হবে। গ্রামারের নিয়ম জেনে

নিয়ে, টেক্সট বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে।”

অঙ্ক বিষয়ে প্রশ্ন করতে প্রধান শিক্ষক জানানেন, “অঙ্কের ভীতি দূর করতে হবে। সবাইকে বুঝতে হবে, ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণী থেকেই অঙ্ক বিষয়ে নিয়মিত জোর না দিলে উঁচু ক্লাসে অসুবিধায় পড়তে হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক অঙ্ক করা অভ্যাসে পরিণত হওয়া দরকার।”

ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে শ্রীদাসের বক্তব্য হল, “ইতিহাসে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সন-তারিখ মুখস্থ না করে প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার পারস্পর্য বজায় রেখে তথ্যভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে নিজের উদ্ভারকে গুছিয়ে তুলতে হবে। সব সময় পাতার পর পাতা লিখলেই ইতিহাসে বেশি নম্বর ওঠে না। ভূগোলে মানচিত্রের ব্যবহার জরুরি।”

‘আনন্দমেলা’ সম্পর্কে তিনি বললেন, “ছেলেমেয়েদের পাঠ্যবইয়ের বাইরের জগৎ সম্পর্কেও আগ্রহ থাকা চাই। আর আনন্দমেলা এ-কাজে এক সহযোগী বন্ধু।”

অপরাজিতা

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে এবার ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ প্রথম হয়ে উঠেছে অংশুমান দেবশর্মা। অংশুমান ক্লাস টু থেকেই এখানে পড়ছে। এবারে পেয়েছে শতকরা ৬৫ নম্বর। দ্বিতীয় হয়েছে দেবতোষ মণ্ডল। তার প্রাপ্ত নম্বর শতকরা ৬৪।

অংশুমান গড়ে দিনে সাত-আট ঘন্টা পড়ে। ভৌতবিজ্ঞান ও অঙ্কে একজন গৃহশিক্ষক তাকে সাহায্য করেন। তা ছাড়া, সব বিষয়েই স্কুলের শিক্ষকরা তাকে সাহায্য করেন। অংশুমান বাংলা ব্যাকরণে বামনদেব চক্রবর্তী ও পি. আচার্য, ইংরেজি কমপোজিশনে ব্যোমকেশ ঘোষ এবং পি. কে. দে সরকার, ইতিহাসে প্রভাতাংশু মাইতি ও কিরণ চৌধুরী, ভূগোলে উপেন রায়-সুরেন চক্রবর্তী এবং এস. পি. চ্যাটার্জির বই, ভৌত বিজ্ঞানে সুখেন্দু মাইতি, চিত্তরঞ্জন



দাশগুপ্ত এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বই, জীবনবিজ্ঞানে কুণ্ড-দাশ-কুণ্ড এবং অমূল্যভূষণ চক্রবর্তীর বই পড়ে। সব প্রশ্নই সে লিখে লিখে তৈরি করে। পরীক্ষার সময় স্বাভাবিক ভাবেই পড়ার সময়ও বাড়ায়। অংশুমানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, তার ঐচ্ছিক বিষয় সংস্কৃত। এই ভাষাটিকে সে ভালবাসে।

অংশুমান স্ট্যাম্প জমায়, ফুটবল খেলে, গল্পের বই পড়ে। বড় হয়ে কী হবে, সে-কথা সে এখনই প্রকাশ করতে চায় না। পাঠ্যবই ছাড়া আর যা সে পড়ে, তার মধ্যে ‘আনন্দমেলা’ থাকেই।

আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি

সোমা দত্ত



খবরটা মস্কো ওলিম্পিকের সময়েই কাগজে পড়েছিলাম। একজন ব্রিটিশ অ্যাথলিট সোনার পদক জেতার আশা নিয়ে গেমসে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেলেন রূপো। লগুনে এক সাংবাদিক সেইদিন তাঁর বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “আপনার ছেলে ওলিম্পিক পদক নিয়ে ফিরছে, ব্যাপারটা ভাবতেই কি

আপনার আনন্দ হচ্ছে না?”

বাবা নিরাসক্ত গলায় উত্তর দিয়েছিলেন, “মোটাই আমার আনন্দ হচ্ছে না। আমার ছেলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কি? জেনে রাখুন, একজন চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে দৌড়ের সময় অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর যত কম পার্থক্যই থাকুক না কেন, আমার কাছে সেই পার্থক্যটা চার বছরের। কেননা, আগামী চার বছরের মধ্যে আর ওলিম্পিক হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। যে চ্যাম্পিয়ন, তার সঙ্গে অন্যদের কোনো তুলনাই চলে না।”

ওই ব্রিটিশ অ্যাথলিট যদি ওলিম্পিকে আমার মতো বাইশতম স্থান পেতেন, তাহলে তাঁর বাবা হয়তো তাঁকে ত্যাজ্যপুত্ররই করতেন। উল্টে আমার বাবা তখনও আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, “এই সামান্য ব্যাপারে যদি ভেঙে পড়িস মা, তো বড় হবি কী করে?” মা আর বাবা যদি সেদিন রেগেমেগে চলে যেতেন, বা কষে এক থাপ্পড় মারতেন, তাহলেও বুঝতাম—দুঃখ পাবার কিছু নেই। আমার এই শাস্তিই তো হওয়া উচিত। কিন্তু ওঁদের চোখমুখ দেখে আমার তখন কান্না আরও বেড়ে যাচ্ছিল।

ল্যানি এই সময় দুটো ‘হট ডগ’ নিয়ে এসে আমার মুখের সামনে ধরলেন। ওই জিনিসটা খেতে দারুণ ভালবাসি। কিন্তু এক কামড় দিয়েই মনে হল, চিরতার জল খাচ্ছি। ফেলে দিতে

যাচ্ছিলাম, ল্যানি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। “করছ কী, তুমি বরং এটা চেখে দ্যাখো। ভাল লাগবে।” বলে বাঁ হাতে রাখা ‘হট ডগ’টা এগিয়ে দিলেন।

ছেলেবেলায় বাগবাজারের বাড়িতে মায়ের কোলে বসে একটা ছড়া পড়েছিলাম। দু-একটা লাইন মনেও আছে। “পারিব না, একথাটি বলিও না আর,/একবার না পারিলে দেখ শতবার।/পাঁচজনে পারে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা...” ইত্যাদি। ল্যানিও ঠিক একই কথা সেদিন বললেন রেঞ্জ থেকে হোটলে ফিরে যেতে যেতে। রাতে শুয়ে-শুয়ে টিভি দেখছি। হঠাৎ শুরু হল, শুটিং ইভেন্ট। রিপ্রে দেখাচ্ছে। সোনারজয়ী স্পার্কিনের হাসি-হাসি মুখ, ইন্টারভিউ দিচ্ছে। দেখেই ফের আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। সারাদিন রেঞ্জে কোনো ভারতীয় সাংবাদিককে দেখিনি। তবে খবর নিশ্চয়ই তাঁরা পেয়ে গেছেন। কলকাতা কেন, সারা ভারতের লোক এতক্ষণে জেনে গেছেন, ওলিম্পিকে সোমা দত্ত কী ফল করেছে। সব কিছু বিশ্বাস লাগছিল। উঠে গিয়ে টিভির সুইচ অফ করে দিলাম।

মন যতই ভার হয়ে থাকুক না কেন, তখনও আমার একটা ইভেন্ট বাকি। স্মলবোর রাইফেল থ্রি পজিশন। অর্থাৎ কিনা, শুয়ে, দাঁড়িয়ে ও হাঁটু গেড়ে বসে লক্ষ্যভেদ করতে হবে। এয়ার রাইফেলে টার্গেট থাকে দশ মিটার দূরত্বে। আর এই ইভেন্টে পঞ্চাশ মিটার দূরে। ভগীরথদা এই ইভেন্টে ওস্তাদ। জাতীয় রেকর্ডও ওরই। আমাকে খুব উৎসাহ দিল আগের দিন প্র্যাকটিসে। আর্মির লোক তো, মনে কোনো আবিলতা নেই। বলল, “তুই এত মনমরা হয়ে যাচ্ছিস কেন। তাও তো তুই প্রথম পঁচিশজনের মধ্যে থাকতে পেরেছিস। আমরা তো কেউ প্রথম তিরিশজনের মধ্যেও থাকতে পারব না। তোর লজ্জা পাবার কোনো কারণই নেই।”

দোসরা আগস্ট থ্রি পজিশন ইভেন্ট শুরু দশটায়। ল্যানির সঙ্গে রেঞ্জে পৌঁছলাম ঘণ্টা দুয়েক আগে। তখনও ফিনফিনে



লস অ্যাঞ্জেলেস ওলিম্পিকের বর্ণাঢ্য সমাপ্তি-উৎসব

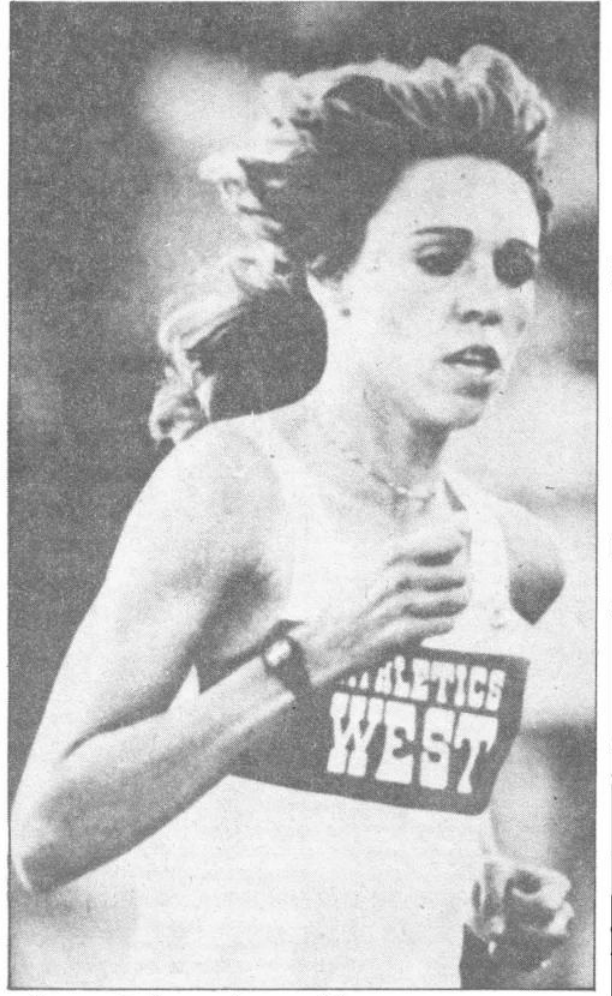
সাদা চাদরের মতো কুয়াশা ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। কড়া রোদ ওঠার পর রেঞ্জ অফিসারের অনুমতি নিয়ে কিছুক্ষণ প্র্যাকটিস সেরে নিলাম। এই ইভেন্টে মোট সাতাশজন প্রতিযোগী যারা এয়ার রাইফেলে অংশ নিয়েছিল, বেশিরভাগ তারাই এতে নামবে। হঠাৎ নজরে এল, একটা চিনা মেয়েকে ঘিরে বেশ ভিড়। কোথায় যেন দেখেছি মেয়েটাকে। ও হ্যাঁ, টিভিতে। এয়ার রাইফেলে ওই মেয়েটাই তো ব্রোঞ্জ জিতেছিল। চিনা ভাষা বোঝার সাধ্য আমার নেই। তবুও মনে হল, চিনা দলের অন্য শুটাররা যেন সবাই মেয়েটাকে বলছেন, সোনা জিততেই হবে। চিনা দলের একটা বিশেষ ব্যাপার লক্ষ করেছি, ওঁদের কেউ প্রতিযোগিতায় নামলে বাকিরা সবাই মিলে উদ্‌গীৰ্ব হয়ে থাকেন, ফলাফল জানার জন্য। যেন একটা পদক নেহাত ব্যক্তিবিশেষের জন্যই প্রয়োজন নয়, এটা দরকার দেশের জন্য। ব্যক্তির কৃতিত্বটাই বড় নয়, বড় হচ্ছে দেশের সম্মান।

থ্রি পজিশনের প্রথমটি প্রোন, অর্থাৎ উপুড় হয়ে শুয়ে গুলি চালানো। এতে গুলি ছুঁড়তে হবে কুড়িটি, পয়েন্ট মোট দুশো। এরপর দাঁড়িয়ে, তারপর হাঁটু গেড়ে। প্রথম দিনকার মতো মনে সেই উত্তেজনা নেই। কেননা, আমি তো আর পদক পাওয়ার জন্য লড়ছি না। আর নিরুদ্বেগ থাকার জন্যই প্রোনে মোটামুটি ভাল স্কোর করলাম। বোর্ডে দেখলাম, সেই চিনা মেয়েটা—যু ১৯৭ আর আমি ১৯৩। পরের কম্পিটিশন দাঁড়িয়ে। গুলি ছুঁড়ে সেটায় আমি পেলাম ১৮৪। আর যু ১৮৭। দু'জনের মধ্যে দুই পজিশনের পর সাত পয়েন্টের পার্থক্য। শুটিংয়ে এটা বিরাট পার্থক্য। মাত্র দু-তিন পয়েন্টের তফাতে একেক জনের পজিশন পনেরো-কুড়ি জনের আগে-পরে হয়ে যায়। শেষ কম্পিটিশন নিলিং পজিশনে। ভাল হল না, পেলাম ১৮৫ পয়েন্ট। মোট তিন পজিশনে ৫৬২ (৬০০-র মধ্যে)। সোনা জিতল ওই চিনা মেয়েটাই ৫৮৯ পয়েন্টে।

আমার ওলিম্পিক অভিযান সেই দিনই শেষ। রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসছি, ভগীরথদা এসে আমাকে অভিনন্দন জানাল। বুঝতে পারলাম না কেন। বাবা-মা'ও পাশে এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হতে লাগল। দেখলাম, ল্যানিকে একপাশে টেনে নিয়ে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি কথা বলছেন। ভগীরথদার কথা কানে এল, “তুই তো আজ থ্রি পজিশনে দারুণ স্কোর করে ফেললি রে। ৫৬২ ন্যাশনাল রেকর্ড। ছেলেদেরও হার মানালি।” ভগীরথদার রেকর্ড ছিল ৫৬১। রেকর্ড মানে ভারতের জাতীয় রেকর্ড। মাত্র আধ ঘণ্টা আগে নিজের অজান্তে সেটা আমি ভেঙেছি।

ল্যানির মুখের দিকে তখন, কেন জানি না, তাকাতেও সাহস পাচ্ছিলাম না। অস্বাভাবিক গম্ভীর। ভিড় পাতলা হতেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “অতঃপর কী করবে? শুটিং ছেড়ে দেবে, না আবার চেষ্টা করবে?” একথা বলে উনি আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

শুটিং ছেড়ে দেব? ল্যানি বলছেন কী? চিৎকার করে কঁদে উঠতে ইচ্ছে করল। ল্যানি আমাকে পরীক্ষা করছেন? বললাম, “অবশ্যই শুটিং করব এবং এর পর থেকে দিনে দশ ঘণ্টা।” আমার কথায় কিছুটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেই ল্যানি আর কিছু বললেন না।



মেরি ডেকার (স্বর্ণজয়ের স্বপ্ন ভেঙে গেল)

টেব্রুস থেকে যেদিন লস অ্যাঞ্জেলেস পৌঁছেছিলাম, এয়ারপোর্টেই সংগঠকরা রাইফেল জমা রেখেছিলেন। পরদিন রাইফেল হাতে পেয়েছিলাম রেঞ্জে একটা তালা-চাবি দেওয়া খুপরিতে। ওঁরা রাইফেল ভিলেজে নিয়ে যেতে দেননি। রোজ প্র্যাকটিস করতাম, আর খুপরিতে রেখে দিয়ে যেতাম। যেদিন আমার ইভেন্ট শেষ হল, সেদিন কিন্তু আর ওঁরা মানা করলেন না। শুটিং সরঞ্জামগুলি সব বাস্তবন্দী করলাম। তারপর খুপরি চাবিটা রেঞ্জ অফিসারের হাতে জমা দিয়ে গেমস ভিলেজ রওনা হলাম।

প্রায় পাঁচ মাস হয়ে গেল ওলিম্পিক শেষ হয়েছে, কিন্তু সেই দিনগুলোর কথা এখনও ভুলতে পারছি না। প্রত্যাশিত ফল করতে পারিনি আমারই গলতিতে। আমি কেন, পি টি উষা বাদে আমাদের কেউই তেমন উল্লেখ্য কিছু করতে পারিনি। জানি না, অন্যরাও আমার মতো কষ্ট পাচ্ছে কি না। সব থেকে খারাপ লেগেছে, পদক-তালিকাতে আমরা নাম পর্যন্ত তুলতে পারিনি। আমাদের কেউ পদক পায়নি বলে। আমার ইভেন্ট হয়ে যাবার পরও দিন-সাতক লস অ্যাঞ্জেলেসে ছিলাম। সেই সময় খুবই লজ্জা লাগত। দেশের মর্যাদা আমরা বাড়াতে পারতাম, যদি কেউ পদক পেতাম। উষা অগ্নের জন্য পদক হারাল। ওর সেই রেস দেখার সুযোগ পাইনি। যেহেতু স্টেডিয়ামে যাবার ইচ্ছেটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলাম তখন।



জোলা বাড (অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা)

পাঁচ আগস্ট গেমস ভিলেজ থেকে চলে এসেছিলাম। বাকি পাঁচ দিন ছিলাম হোটেলে। সেই অলস দিনগুলি আর কাটতেই চাইত না। খবরের কাগজের পাতা ওলটাতাম। চল্লিশ পাতা শুধু ওলিম্পিকেরই খবর। আমাদের দেশে যেটা অকল্পনীয়। সারাদিন টিভিতে বিভিন্ন খেলা দেখাত। একটা ব্যাপার খুব বিস্মী লাগত। টিভি এমনভাবে প্রোগ্রামগুলি করত যেন সেটা ওলিম্পিক হচ্ছে না। আমেরিকা বনাম বিশ্বের বাকি দেশগুলির মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা চলছে। যেসব ইভেন্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা সোনা জিতত, সেটা দিনে পঁচিশবার করে দেখানো হত। এ নিয়ে ওখানে অনেক কথাও উঠেছিল। অনেক দেশ তো প্রকাশ্যেই বলে ফেলেছিল,

আমেরিকার টিভি বড্ড বাড়াবাড়ি করছে।

মেরি ডেকার আর জোলা বাডের সেই সংঘর্ষের ঘটনাটা তো জলজ্যান্ত উদাহরণ। ঘটনাচক্রে সেদিন আমি টিভির সামনে বসে। সবার ধারণা, ডেকারই জিতবে। অন্তত কাগজগুলো ওইরকম একটা ধারণাই সাধারণ লোকের মনে গেঁথে দিয়েছিল। তারপর দৌড়ের সময় ওইরকম একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গেল। বাডের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ডেকার ট্র্যাকের বাইরে ছিটকে পড়ল। ওই ধাক্কাধাক্কির দৃশ্যটা টিভিতে স্লো মোশনে এতবার দেখিয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষরা তো বাডের ওপর রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল। সেই সময় বাডকে পেলে ওরা ছিড়ে ফেলত। আমার কিন্তু বাডের জন্য মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বেচারি বাড! কতই বা ওর বয়স। আমার থেকে অল্প কয়েক বছরের মাত্র বড়। আমার বিশ্বাস, কখনই ও ইচ্ছে করে ডেকারকে ধাক্কা মারেনি। একজন অত বড় মাপের অ্যাথলিট কঙ্কনো অন্য আর একজনের প্রতি এতটা আনস্পোর্টিং হতে পারে না।

লস অ্যাঞ্জেলেসে বাবা-মা আমাকে সে সময় বলতেন, “ঘরে বসে থেকে এত ভাবছিস কেন? যা না, ঘুরে-ফিরে যা ইচ্ছে কিনে আন। বন্ধুবান্ধবদের জন্য কিছু নিয়ে যেতে তোর ইচ্ছে করছে না?”

কী বলব? যেটা নিয়ে যাবার আশা করে এসেছিলাম, সেটাই পেলাম না। সত্যি বলতে কী, আমার তেমন কোনো বন্ধুও নেই। আমার জীবনটা একেবারে ছকে বাঁধা। পড়াশুনো আর শুটিং, এই করেই দিন কেটে যায়। আমার বয়সী কত মেয়ে হেসে-খেলে গল্প করে সময় কাটায়। পূজোর সময় আনন্দ করে। সিনেমা-থিয়েটার, আমোদের কত উপকরণ তাদের সামনে। আমি তাদের হিংসে করি না। আমার আনন্দের মাধ্যম যে অন্য। ভাইফোঁটার সময় কিন্তু একেবারে মন খারাপ হয়ে যায়। আমার একটা মাত্র ভাই। ফোঁটার দিনে হয়তো আমি দিল্লিতে অথবা অন্য কোনো জায়গায় গিয়েছি—শুটিং করতে অথবা ট্রেনিং নিতে।

একেক সময় মনটাকে সাবুনা দিই, ওলিম্পিক পদক পাইনি তো হয়েছেটা কী। আমার এখনও তিনটে ওলিম্পিকে অংশ নেবার বয়স রয়েছে। পি-টি-উষাও তো মস্কো ওলিম্পিকে বিজিরি রেজাল্ট করেছিল। লস অ্যাঞ্জেলেসে যা হোক ভাল ফল করেছে। আমিই বা আগামী সিওল ওলিম্পিকে ভাল ফল করতে পারব না কেন? ওলিম্পিকের আসরে প্রথমবার সবাই কি সফল হয়? পদক না পাই, আমাদের পুরুষ শূটারদের থেকে তো ভাল স্কোর করেছে। আর কোন্ খেলায় আমাদের দেশে একটা মেয়ে ছেলেদের টেকা দিতে পেরেছে? ওলিম্পিক থেকে ফিরে আসার পর অনেকেই আমাকে কটাক্ষ করেছেন। আমি এতে দুঃখ পাইনি। ল্যানি বলতেন, “প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও নিজেকে যে ঠিক রাখতে পারে, সেই সফল হয়।” আমি এখন নিজেকে ঠিক রাখার চেষ্টাই করে যাচ্ছি। আগামী ওলিম্পিক পর্যন্ত সেই চেষ্টা করে যাব।

পুনশ্চ : ল্যানির কাছে কথা দিয়েছিলাম, দিনে দশ ঘণ্টা শুটিং করব। দিল্লির হাডু-কাঁপানো শীতের মধ্যেও প্র্যাকটিস চালিয়ে কথা রাখছি। আমার ওলিম্পিকের ডায়েরি যারা পড়েছে, সুদূর দিল্লি থেকে তাদের একসঙ্গে বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

(সমাপ্ত)



গোলের রহস্য

অমিতাভ দত্ত

শনিবার বিকেল চারটেয় নীরদাময়ী বিদ্যাপীঠ এবং রতনপুর হাইস্কুলের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ। সাত-আটদিন আগে থেকেই তাই দুটো স্কুলে সাজো-সাজো রব। টিম সিলেকশন চলছে। কোন্ টিম কীরকম খেলবে তাই নিয়ে জোর জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে। ভীষণ প্রেসটিজের খেলা এটা। বছরে এই দুটো স্কুল মাত্র একবারই খেলে নিজেদের মধ্যে। যে-দল হারে সারা বছর তারা অন্যদের কাছে মুখ দেখাতে পারে না।

গত বছর হেরেছিল নীরদাময়ী বিদ্যাপীঠ। এ-বছর তারা তাই বেশি চিন্তিত। গত বছরের হারের শোধ নিতে না পারলে মান থাকবে না।

আর মাত্র চার দিন খেলার বাকি। নীরদাময়ী স্কুলের খেলার শিক্ষক ত্রিভঙ্গমুরারিবাবুর চোখে ঘুম নেই। অনেক

চেষ্টার পর রাতে ঘুম এলে তিনি স্বপ্ন দেখেন তাঁর স্কুল গোল খাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেন। কিছুতেই ঘুম আসে না। বাকি রাতটুকু গালে হাত দিয়ে বসে খেলার কথা ভাবেন।

ত্রিভঙ্গমুরারিবাবু ছাড়াও আর একজন এই খেলা নিয়ে খুব ভাবছে। সে হল নীরদাময়ীর ক্যাপটেন' ব্যোমকেশ পাকড়াশি। খেলার জন্যই শুধু তাকে স্কুলে রাখা। মাইনে-টাইনে লাগে না। গত তিন বছর ধরে সে ক্লাস নাইনে পড়ছে। ক্লাস টেনে এ-জীবনে তার পড়া হবে কি না জানে না। তিনকড়ি এ-বছর ক্লাস নাইনে উঠে ব্যোমকেশের সহপাঠী হয়েছে। হিসেবমতো তার ব্যোমকেশকে 'ব্যোমকেশদা' বলা উচিত, কিন্তু সে নাম ধরে ডাকে।

ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা তিনকড়ি পছন্দ করে না। সে টারজানের ভক্ত। টারজানের মতো বীর এবং সাহসী হতে চায়। ঝুলে-ঝুলে এক গাছ থেকে অন্য গাছে অনায়াসে চলে যাবে। কেউ কোনো অন্যায় করলে তাকে এক ঘুসিতে

কুপোকাত করে দেবে। সেই তিনকড়ি ফুটবল প্র্যাকটিস করছে শুনে স্কুলের সবাই অবাক হয়ে গেল। এ যে ভূতের মুখে রাম-নাম।

এক ক্লাসে পড়লেও ব্যোমকেশের সঙ্গে তিনকড়ির তেমন ভাব ছিল না। কিন্তু ম্যাচের কয়েক দিন আগে থেকে ক্লাস নাইনের ছেলেরা লক্ষ করল, তিনকড়ি আর ব্যোমকেশের মধ্যে খুব ভাব। দু'জনে এক বেঞ্চে বসে। একসঙ্গে টিফিন করতে যায়। এমনকী দুজনের দু-পাড়ায় বাড়ি হলেও একসঙ্গে স্কুল থেকে বেরিয়ে গল্প করতে করতে থানার মাঠে যায়। সেখানে ওরা ফুটবল প্র্যাকটিস করে তিনকড়ির ব্যায়াম-গুরু নিকুঞ্জ পালের কাছে। নিকুঞ্জদা হল এই থানার একজন কনস্টেবল। এক সময় নাকি দারুণ ফুটবল খেলত।

দু'দিন পরে আসল রহস্যটা জানা গেল। ত্রিভঙ্গমুরারিবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে টিম সিলেকশন করতে গিয়ে পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। ব্যোমকেশ স্ট্রাইকারে নিলু হাজারার জায়গায় তিনকড়িকে খেলাতে চায়। ওর কথা শুনে তো ত্রিভঙ্গমুরারিবাবুর গাছ থেকে পড়ার অবস্থা। গত তিন বছরের রেগুলার স্ট্রাইকার নিলু। গোল করার মাস্টার বলা যায়। তাকে বসিয়ে কিনা যে কোনোদিন ফুটবলে পা দেয়নি সেই তিনকড়িকে খেলাতে চাইছে ব্যোমকেশ। ত্রিভঙ্গমুরারিবাবু কোনোরকমে বললেন, “এ কী বলছ তুমি?”

ব্যোমকেশের এক গোঁ। নিজের কথা থেকে এক পা নড়বে না। সে বলল, “তিনকড়ি না খেললে আমি খেলব না।”

ত্রিভঙ্গমুরারিবাবুর মাথায় যেন বাজ পড়ল একথা। শুধু এই স্কুলে নয়, আশেপাশে দশ-বারোটা স্কুলে ব্যোমকেশের মতো রাইট আউট একজনও নেই। যে-কোনো স্কুল টিমের ডিফেন্স ওর পায়ে বল পড়লে ভয় পায়। সেইরকম একজন খেলোয়াড় বলছে কিনা আমি খেলব না।

সুতরাং সর্ব দিক রক্ষা করার জন্য তিনকড়িকেই টিমে রাখতে হল। এছাড়া ত্রিভঙ্গমুরারিবাবুর কিছু করার ছিল না।

দেখতে-দেখতে শনিবার এসে গেল। সেদিন সকাল থেকেই যেন অন্যরকম ব্যাপার। ভয়ে নীরদাময়ী বিদ্যাপীঠের কেউ জোরে কথা বলছে না। এমনকী বাঘের মতো হেডমাস্টারমশাইয়ের বাজখাঁই গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না কেউ। মিনিটে মিনিটে তাঁর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, বেয়ারা হরির কাছে জল চাইছেন। ফাস্ট পিরিয়ডের পর খেলোয়াড়দের ডেকে তিনি মিনমিনে গলায় বললেন, “বাবা তোমরাই আমার মান বাঁচাবে আজ।” তারপর প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। খেলোয়াড়রা হেডস্যারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল একে একে।

ত্রিভঙ্গমুরারিবাবু তিনকড়িকে আলাদাভাবে ডেকে শুধু বললেন, “তিনকড়ি, আমায় ডুবিয়ে দিস না বাবা।” তিনকড়ি সে কথা শুনে মুচকি একটু হাসল শুধু। মুখে কিছু বলল না।

দুপুর একটা থেকে নীরদাময়ী বিদ্যাপীঠ থেকে এক ক্রোশ দূরে রতনপুর স্কুলের মাঠে ভিড় জমতে শুরু করল। তিনটের মধ্যে দু'পক্ষের সমর্থকে মাঠ ভরে গেল। দু'পক্ষই এখন থেকে চিৎকারে মাঠ গরম করে তুলেছে। মাঠের ঠিক মধ্যখানে—সাইড লাইন থেকে হাত দশেক দূরে ছোট একটা প্যাণ্ডোল খাটানো হয়েছে। সেখানে চেয়ার-টেবিল পেতে দুই স্কুলের মাস্টারমশাই এবং গণ্যমান্যরা বসেছেন।

নীরদাময়ী স্কুলের খেলোয়াড়রা হেঁটে মাঠে এল। শুধু তিনকড়ি আর ব্যোমকেশ এসেছে তিনকড়ির রোগা হাড়জিরজিরে ঘোড়ায় চড়ে। দুই তাগড়াই তরুণকে পিঠ থেকে নামিয়ে ঘোড়াটা জিভ বের করে দম নিচ্ছে। ঘোড়াটাকে ক্লাসের একজন ছেলের জিম্মায় রেখে খেলার ড্রেস পরে ফেলল তিনকড়ি। পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা মজবুত শরীরে সুন্দর মানিয়েছে তাকে।

টসে হেরে গেল ব্যোমকেশ। রতনপুর স্কুলের ক্যাপ্টেন সাইড নিল। তারা গোলকিপারের চোখে যাতে রোদ না লাগে সেজন্যে পশ্চিম দিকের গোল আগলাবে। সুতরাং, নীরদাময়ীর সেন্টার।

রাইট আউট ব্যোমকেশ। স্ট্রাইকার তিনকড়ি আর রঞ্জন। লেফট আউট ইয়াকুব। রেফারি রতনপুর স্কুলের খেলার শিক্ষক গোবর্ধনবাবু ঘড়ি ধরে কাঁটায়-কাঁটায় চারটে বাজতেই হুইসল বাজিয়ে দিলেন।

তিনকড়ির পায়ে বল ছিল। বাঁশির আওয়াজে ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াহুড়োয় ব্যোমকেশকে পাস করতে গিয়ে সে রতনপুরের স্ট্রাইকার বিজনের পায়ে বল তুলে দিল। বিজন মুহূর্তে আঙুয়ান তিনকড়িকে কাটিয়ে তাদের রাইট আউটকে একটা মোক্ষম থ্রু বাড়াল। শুধু গোলকিপার আর রাইট আউট। কিন্তু নীরদাময়ীর গোলকিপার শূন্য লাফিয়ে দু'হাতের মুঠোয় বলটাকে আঁকড়ে ধরতে সারা মাঠ হাততালিতে ফেটে পড়ল। শাবাশ মজনুর!

মজনুর বল ছুঁড়ে রঞ্জনকে দিতে সে সঙ্গে-সঙ্গে ব্যোমকেশকে ঠেলে দিল। দু'পায়ে বল আয়ত্ত্ব করে প্রতিপক্ষের ডিফেন্সকে একবার দেখে নিল ব্যোমকেশ। তারপর ওদের হাফকে ডজ করে পিছনে ফেলে গোলমুখে বল তুলে দিল। মাথা ঠেকালেই গোল। কিন্তু কোথায় তিনকড়ি। সে তখন মাঝমাঠে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে ব্যোমকেশের খেলা দেখছে। কাজেই রতনপুরের গোলকিপারের বল ধরতে একটুও অসুবিধে হল না। তাই দেখে ব্যোমকেশ রাগে শুধু একবার দাঁত চেপে বলল, “এই তিনকড়ে!”

এইভাবে দু'পক্ষের লড়াই জমে উঠল। যেন দুটো স্কুল নয়, মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে খেলা হচ্ছে। এ দল এখনি আক্রমণ করে তো পরের মুহূর্তে অন্য দল। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে সারা মাঠ। তিনকড়ি হাফটাইমের আগে আর একবার বল পেয়েছিল। বুক দিয়ে যে-বল ধরার কথা সে-বল হেড করে নষ্ট করে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে টেঁচিয়ে উঠল, “তিনকড়ি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি যা, ফুটবল খেলা তোমার জন্য নয়।” তারপরই হো-হো করে হাসির বান ডাকল মাঠে। তিনকড়ি লজ্জায় মাথা নিচু করল, মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল তার।

হাফটাইম হলে ত্রিভঙ্গমুরারিবাবু ব্যোমকেশকে আড়ালে ডেকে বললেন, “বাবা ব্যোমকেশ, তিনকড়িকে এবার বসিয়ে দাও। নিলু খেলুক ওর জায়গায়।”

ব্যোমকেশ রাজি হয় না। বলে, “না।” ত্রিভঙ্গমুরারিবাবুর হতাশ মুখটার দিকে তাকিয়ে সে মনে-মনে বলে, পাঁচদিনের আলুকাবলি আর ফুচকার ঋণ এভাবে ছাড়া শোধ করবার উপায় নেই আমার স্যার। তা ছাড়া সে ভাবে, তিনকড়ি তাকে আশ্বাস দিয়েছে গোটা ম্যাচ মাঠে রাখলে ‘চক্রবর্তী কেবিনে’

কাল মোগলাই খাওয়াবে। সে-কথা ভাবতেই জিভে জল এসে যাচ্ছে এখন ব্যোমকেশের।

মাঠসুদ্ধ সবাই দেখল, হাফটাইমের পর খেলা শুরুর ঠিক আগে ব্যোমকেশ তিনকড়িকে ডেকে কানে কানে কী যেন বলল। তিনকড়ি মাথা নেড়ে সাই দিল সে-কথায়।

খেলা শুরু হতেই দু'পক্ষে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। কখনও মনে হল এই বুঝি নীরদাময়ী গোল দেবে। পরক্ষণেই উল্টো ব্যাপার। রতনপুর বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বিপক্ষের গোল-সীমানায়। পঁচিশ মিনিট এইভাবে দমবন্ধ-করা খেলা চলল। এই সময়ের মধ্যে তিনকড়ি মোটে একবার বল পেয়েছে। ইয়াকুব নিজেদের ডিফেন্স থেকে বল তুলে এনে গড়ানে শটে ওকে দিল। একেবারে পায়ে। কিন্তু একটা বলকে কন্ট্রোল করা যে এত কঠিন সে-কথা আজই প্রথম হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে তিনকড়ি। বহু কষ্টে বলটা কোনোরকমে থামাতেই বিপক্ষের একজন ডিফেন্স চিলের মতো ছোঁ মেরে বল কেড়ে নিল। দুঃখে তিনকড়ির চোখে জল এসে গেল। মুখ তুলতেই সে দেখতে পেল—হেডমাস্টারমশাই রাগে প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে পায়চারি করছেন প্যাণ্ডেলের সামনে। দেখে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল তিনকড়ি। সে বুঝতে পারল, আজ তার নিস্তার নেই, হেডমাস্টারমশাই নির্ঘাত তার পিঠে বেত ভাঙবেন খেলার পরে।

খেলা শেষ হতে মিনিট দুই বাকি আছে, ব্যোমকেশ বল পেল। রঞ্জন নিজেদের হাফ অঞ্চল থেকে বাড়িয়েছে তাকে। বল ধরেই সাইড লাইন ধরে ছুটে লাগল ব্যোমকেশ। সে কী ছুট! যেন সে ছুটে গিয়ে নিজেই গোল দিয়ে আসবে। পরপর তিনজন বিপক্ষের ডিফেন্সকে আউটসাইড ইনসাইড ডজ করে ব্যোমকেশ ফ্ল্যাগের ধারে চলে গেল। বল থামিয়ে তারপর হাত তুলে তিনকড়িকে কী যেন নির্দেশ দিল। তিনকড়ি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ঠিক রতনপুরের গোলকিপারের সামনে—ওদের বেষ্টে স্টপার সুধীরের গা স্টেটে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশের দিকে তাকাল। তখনি ব্যোমকেশের সেন্টার। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বল উড়ে এসে তিনকড়ির বাঁ দিকের কপালে আছড়ে পড়ল। বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল ওর মাথা। চারদিক কেমন যেন ধোঁয়াটে হয়ে গেল। কিছু দেখতে পাচ্ছে না তিনকড়ি, এখনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে ও।

সেই সময় আকাশফাটানো একটা চিৎকার তিনকড়ির কানে এল, গো—ও—ল। সে কিছু বুঝবার আগে কারা যেন তাকে ধরাধরি করে কাঁধের উপর বসিয়ে দিল। সেই অবস্থায় শুরু হল উদ্দাম নাচ। নাচ আর থামে না। একজনের কাঁধ থেকে আর-একজনের কাঁধে চেপে বসছে তিনকড়ি। আরামে সে চোখ বুজে ফেলল। এই সময় তার মনে হল, ঘোড়ায় চড়ার থেকে মানুষের কাঁধে চড়ায় ঢের বেশি আনন্দ।

একটু পরে তিনকড়িকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতে হেডমাস্টারমশাই এসে তাকে বললেন, “যা একখানা গোল দিয়েছিস বাবা, আমি সারাজীবনে ভুলব না। তোর মাথা আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব।” ত্রিভঙ্গমুরারি বাবু ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, “তুই আমাদের মান রাখলি তিনকড়ি।” ওঁদের কথা শুনে তিনকড়ি নিশ্চিত হল, গোলটা সে-ই দিয়েছে।



সেন্টার হবার সঙ্গে-সঙ্গে খেলা শেষ। বিমর্ষ গোবর্ধনবাবু লম্বা বাঁশি ফুঁকে মাথা নিচু করে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

খেলা ভাঙার পর বন্ধুরা যখন সবাই ঘিরে ধরে বলল, “হ্যাঁ রে তিনকড়ি, হাফটাইমের সময় ব্যোমকেশ তোকে কানে কানে কী বলেছিল রে?” তিনকড়ি তখন বিজ্ঞের মতো হেসে বলল, “বলব কেন!”

তারপর ব্যোমকেশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। ব্যোমকেশও একটু হাসল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

সেই রহস্য ওরা আজও ভাঙেনি। নীরদাময়ী বিদ্যাপীঠের ছেলেরা এখনও জানে না ব্যোমকেশ সেদিন মাঠে তিনকড়ির কানে কী মন্তর দিয়েছিল!

হবি শেখর রায়

ধাঁধা

বয়স নিয়ে এর আগে যত ধাঁধা শুনেছি, সবার শেষেই প্রকট হয় এক ধরনের। কার কত বয়স, সেটা বার করতে হবে। তার জন্য অবশ্য নানান রকম তথ্য দেওয়া থাকে। যেমন, এ ওর থেকে এখন দশগুণ বড়, কিংবা এত বছর আগে এর বয়স ছিল ওর বয়সের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার যেন মনে হয়, অঙ্কের বইতেও এইরকমই কিছু-কিছু অঙ্ক দেখেছি। জানি না, অঙ্কগুলোকেই ছোট্টা ধাঁধা বলে মাঝেমধ্যে উপহার দেয় কি না। ধাঁধার মধ্যে একটু-আধটু অঙ্ক থাকতে পারে, কিন্তু অঙ্কেই ধাঁধা বলাটা যেন কীরকম-কীরকম লাগে।

আমার এই খটকার কথাটা সেদিন ছোট্টাকাকে বলেই ফেললাম। আসলে হয়েছে কী, আমাদের স্কুলেই বার্ষিক পরীক্ষায় এমন একটা অঙ্ক দিয়েছিল। আমার আবার সেটার উত্তরটা জানা ছিল, কেননা ঠিক ওইরকমই একটা ধাঁধা ক'দিন আগে কোথাও শুনেছিলাম। কিন্তু হলে কী হবে, সেই উত্তরে কী করে পৌঁছতে হবে, সেটা আমার জানা ছিল না। তাই শেষ



পর্যন্ত আমি অঙ্কটাতে শূন্যই পেলাম। অথচ ভাবো, উত্তর নির্ভুল।

সেদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি আমি আর ছোট্টাকা, হঠাৎ ছোট্টাকা করল কী, আমারই বন্ধু জয় আর তার মামাকে দেখিয়ে আমায় বলল, “ওই যে দুজন চলে যাচ্ছে, ওদের দুজনকে দিয়েই বয়সের ধাঁধা বানাব এসো। আর বয়সটাও বলে দেব আগে-ভাগে।”

“বয়স বলে দিলে ধাঁধা হবে?” আমি বেফাঁস বলে ফেললাম। ছোট্টাকা আমাকে কড়া ধমকের গলায় বলল, “ধাঁধা কি বয়সের মধ্যেই থাকে? ধাঁধা থাকে সব জায়গায়। আগে শোনো, পরে কথা বলো।” বলে ছোট্টাকা ধাঁধাটা বলল আমায়।

ছোট্টাকার সেই ধাঁধাটা কী শুনবে? এটাই হোক এবারের পয়লা নম্বর ধাঁধা।

প্রথম ধাঁধা ॥ জয়ের বয়স এখন ১৩, তার মামার বয়স ৪০। কত বছর আগে জয়ের মামা ছিল জয়ের চারগুণ বয়সী?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ এমন একটা সংখ্যা বলো যার দ্বিগুণের সঙ্গে অর্ধেকের তফাত ঠিক নিবানবই।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও— তাকতিনুগগ

গতবারের উত্তর ॥ (১) মতিলাল নেহরু। (২) নাম। (৩) ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১	২			৩	৪	৫
৬			৭		৮	
		৯				
১০	১১				১২	
	১৩					
১৪					১৫	১৬
১৭					১৮	

সংকেত : পাশাপাশি : (১) নিরানন্দ। (৩) আলাপে পটু। (৬) পুরাতন। (৮) বানর। (৯) বাজনাবিশেষ। (১০) এক মাসে দুবার আসে। (১২) মুকুট। (১৩) সে-যুগের রাম এ-যুগের ছদ্মনাম। (১৪) প্রতিজ্ঞা। (১৫) দড়ি। (১৭) অম্লরস। (১৮) সমান।

উপর-নীচ : (১) প্রতিকূল। (২) মণিমুক্তা। (৪) টিয়াপাখি। (৫) অর্জুনের রথ। (৭) লোকগণনা। (১১) বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একজন। (১২) পদ্মফুল। (১৪) ছবি। (১৬) ফল অথচ সবজি।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

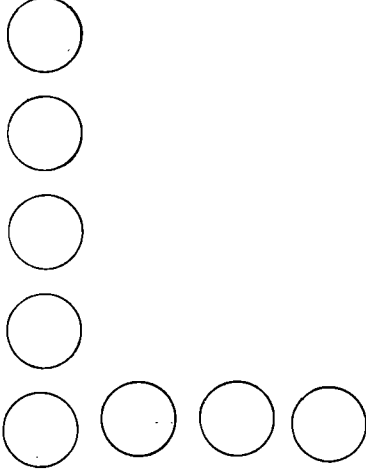
গত সংখ্যার সমাধান

পা	লা	মৌ		ক	ল	স
র		ন	গ	রী		ব
মা	ঞ্জা		ক্ল		ইঁ	শ
ণ		দা	মা	মা		ক্তি
বি	প্র		দ		নি	মা
ক	চ্ছ		ন		দা	ন
	দ	সু		মে	ঘ	

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার জন্য চাই আটটি সিকি কিংবা দশ পয়সা/পাঁচ পয়সা, যা পাওয়া সহজ হয়। মোট কথা; এক রকমের আটটি পয়সা চাই।

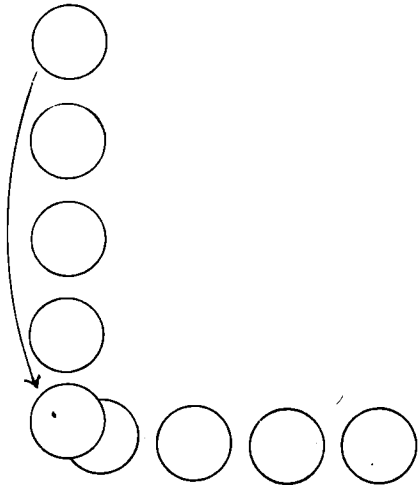
পয়সা আটটিকে নীচের ছবির মতন টেবিলের ওপর সাজাও—



ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো এই ছবির এক দিকে পাঁচটি পয়সা, অন্য দিকে তিনটি। তবে তিনটি এমনভাবে রয়েছে যে, চারটিও বলা যায়। তাই না?

এবার বন্ধুদের বলো, এই পয়সাগুলো থেকে মাত্র একটিকে সরিয়ে এমনভাবে আবার বসাতে হবে, যাতে কিনা লম্বালম্বি বা আড়াআড়ি দু-দিকেই পাঁচটি করে পয়সা দেখা যাবে।

বন্ধু চেষ্টা করুক। তুমি করো। আর যারই আগে সমাধান হোক-না কেন, তার উত্তর কীরকম হবে, তার একটা আভাসও নীচে দেওয়া রইল। মিলিয়ে নেওয়া যাবে এই উত্তরের সঙ্গে :



অর্থাৎ লম্বালম্বি পয়সাগুলোর সব থেকে ওপরেরটা তুলে নিয়ে দু-দিকের মধ্যখানের পয়সার উপর বসাচ্ছ। ফলে দু-দিকেই হচ্ছে পাঁচটি করে।

মজার

হাসিখুশি



“বাবুদের ছবিটা বেশ ভালই ঐকেছ, কিন্তু লেজটা আঁকলে না কেন?”

“তুমি তো আমাকে বলোনি, তোমার লেজ আছে!”

“তোমার মতো বোকা আর দুটি দেখিনি। তুমি কিনা কাল শহিদ মিনারটাই বিক্রি করে দিচ্ছিলে!”

“তাতে কী হয়েছে?”

“আরে, আমিই যে ওটা কিনতে চেয়েছিলাম।”

“এই ছবিটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম। যখন আমি ছবিটি আঁকতে শুরু করেছিলাম তখন জানতামই না এটি কী হবে।”

“ছবিটি শেষ করেও কি বুঝতে পারছ এটি কী হয়েছে?”



“সারাদিন তোমার দেখা পেলাম না। কোথায় ছিলে বলো তো?”

“চিড়িয়াখানায়।”

“খাঁচার ভিতরে না বাইরে—সেটাই তো জানতে চাইছি।”

“আপনার নামটা কী বলবেন?”

“কেন, লেখার নীচেই তো আমার নাম সই করেছি!”

“সেই কারণেই তো আমার কৌতূহল।”

“আমার গান শুনতে পেয়ে আপনারা যে অত দূর থেকে ছুটে আসবেন ভাবতে পারিনি।”

“গান শুনে তো আসিনি। ভাবলাম কোথাও ডাকা পড়েছে, তাই।”

“তুমি এভারেস্টের চূড়া থেকে লাফ দিতে পারবে?”

“পারব। তবে ‘কল্লনায়’ শব্দটা যোগ করে নিয়ে।”

ছবি : অহিভূষণ মালিক



মঙ্গের নতুন সম্রাট বারিনের আজ অভিষেক...

ফ্যাশের
কাছে আমরা
ঋণী !



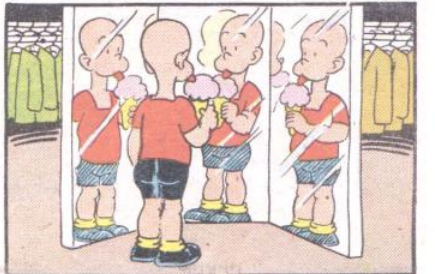
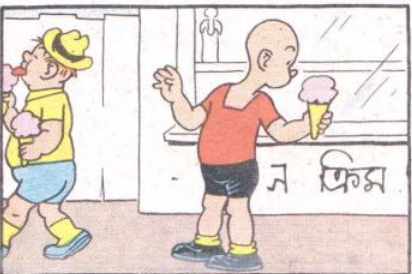
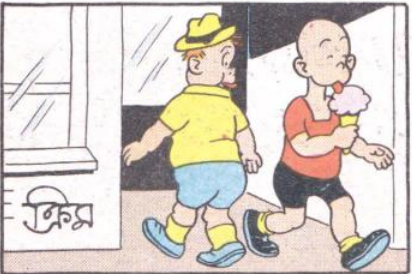
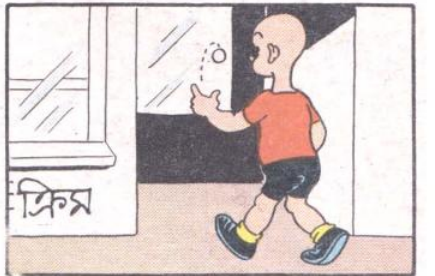
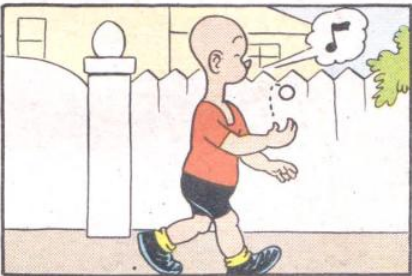
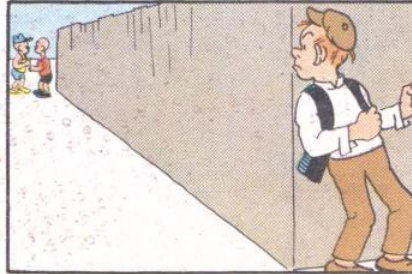
জয়ধ্বনি উঠল ফ্যাশের নামে...

জয় ফ্যাশ গার্ডন !



ভালটানকে সৈন্যাদ্যক্ষ-পদে নিয়োগ
করছি। সবাই সুখশান্তিতে
জীবন কাটাক !

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)



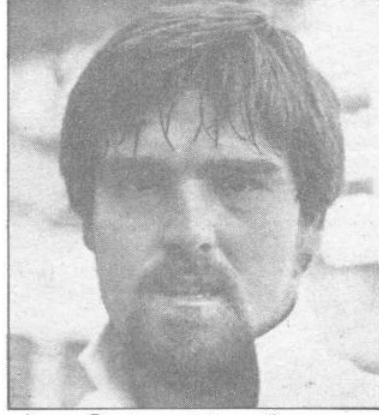
ভারত জয়ে ফিরল

রাজা গুপ্ত

‘তরুণের কাঁধে বয়স্কের মাথা।’ কথাটা রবি শাস্ত্রী সম্পর্কে বলা হত এই কারণে যে, অল্পবয়সী এই ক্রিকেটারটির ক্রিকেট-বুদ্ধি অনেকের থেকেই বেশি। কথাটা আরেকবার প্রমাণিত হল, যখন ইংল্যান্ডের প্রায় পুরো টেস্ট টিমের বিরুদ্ধে পঁচিশ বছরের কম বয়সী দলকে নিয়ে সে যুদ্ধ জয় করল। বিনা দ্বিধায় বলা যাচ্ছে, ভারতের ভবিষ্যৎ অধিনায়ক পদটির জন্যে শাস্ত্রীর দাবি জোরালো হল।

প্রথম টেস্টের আগে ইংল্যান্ড ম্যাচ প্র্যাকটিসে মনোযোগী হতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজিন্দর সিং ঘাই নামের উদ্যমী শিখ তরুণটি বাতাসে এবং জমিতে ক্রমাগত বলের দিক পরিবর্তন করে সৃষ্টির হতে দেয়নি ইংরেজদের। সেই সঙ্গে ছিল গোপাল শর্মা ও শিবরামকৃষ্ণনের অফ স্পিন-লেগ স্পিন কন্ট্রোল। এই সাঁড়াশি আক্রমণের বিরুদ্ধে ইংরেজ ব্যাটসম্যানদের প্রায় সময়ই মনে হয়েছে বিপন্ন ও অনিশ্চিত। এই ম্যাচে অসাধারণ সাফল্যের সুবাদেই ‘শিব’ বোম্বাই টেস্টে ভারতীয় দলে জায়গা পেয়ে গেল। এবং প্রথম টেস্টেই সে বাজিমাত করল লেগ স্পিন, টপ স্পিন, গুগলির ম্যাজিক দেখিয়ে।

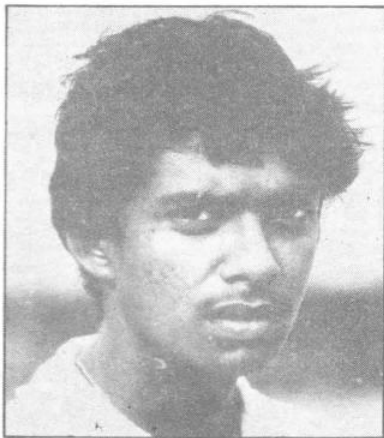
১৯৮১ সালে কিথ ফ্লেচারের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বোম্বাই টেস্টে ভারত



মাইক গ্যাটিং (প্রথম টেস্ট-সেঞ্চুরি)

শেষবারের মতো টেস্ট ম্যাচে জয় পেয়েছিল। একটানা ৪৪টি টেস্টে না-জেতার যে বিশ্বরেকর্ড আছে নিউজিল্যান্ডের, সেই বিচ্ছিরি রেকর্ডটার দিকে গাড়িয়ে যাচ্ছিল ভারত একটু-একটু করে। ধারাটিকে রুখলেন গাওস্কর। তাঁর অধিনায়কত্বে ভারত শেষ জয় পেয়েছিল; তাঁর অধিনায়কত্বেই ভারত আবার জয়ের মধ্যে ফিরল।

প্রথম টেস্টের আগে দুটো ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এক, একান্ন বছরের মধ্যে এটাই সবচেয়ে দুর্বল ইংল্যান্ড দল। দুই, এই দলের বোলিং ভারতকে দুবার আউট করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। সুতরাং শুরু থেকেই ভারত প্রবলতর প্রতিপক্ষের



শিবরামকৃষ্ণন (ঘূর্ণিবলে নবীন প্রতিভা)



রবি শাস্ত্রী (সংযত সেঞ্চুরি)

ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়ে গেল।

ডেভিড গাওয়ারের বরাত বড়ই মন্দ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ফাইভ নিল খাওয়ার পরে অধিনায়কত্ব ব্যাপারটি নিয়ে সমালোচনার চাপে তিনি দিশেহারা। ভারতের বিপক্ষেও প্রথম টেস্টে ‘হেরো’ টিমের দুর্নাম থেকে তিনি বাঁচাতে পারলেন না ইংল্যান্ডকে। অবশ্য দোষ শুধু একা গাওয়ারকে দিয়ে কী হবে। সহজ পিচে মাত্র ১৯৫ রানে গোটা দল মুড়িয়ে গেলে গাওয়ার একা আর কী করবেন। পরিস্কার বোঝা গেল, লেগ স্পিনের মোকাবিলায় ইংলিশ ব্যাটসম্যানরা পুরোপুরি ব্যর্থ।

ইংল্যান্ডের পেস বোলারদের মধ্যে কাওয়ানস ছাড়া আর কেউ মনে রাখার মতো কিছু করেননি। দুই সাধারণ মানের অফ-স্পিনার প্যাট পোকক এবং ফিল এডমন্ডসের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা সকলেই ছিলেন মোটামুটি স্বচ্ছন্দ। বিশেষভাবে উল্লেখ্য দুটি নাম হল রবি শাস্ত্রী ও সৈয়দ কিরমানি। দুজনের জোড়া সেঞ্চুরি এবং সপ্তম উইকেটে ভারতের রেকর্ড, শুধু এই তথ্যে নয়, দুজনের সংযমী ইনিংস ভারতকে বড় রানের ভরসা এনে দিয়েছে। ২৭০ রানে পিছিয়ে থেকে ইংল্যান্ড ইনিংস পরাজয় থেকে বাঁচতে পারে কি না এটাই ছিল দেখবার। মাইক গ্যাটিং জীবনের প্রথম সেঞ্চুরি দিয়ে বোঝাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন যে, এই সহজ উইকেটে বিপক্ষ বোলিংয়ে জুজু দেখা মানেই নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। কিন্তু একমাত্র ফাউলার এবং ডাউনটন ছাড়া ক্রিকে জমাট হয়ে থাকার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না কেউই। ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত ইনিংস পরাজয়ের ধাক্কা সামলায়। শিবরামকৃষ্ণনের দ্বিতীয় দফাতেও সংগ্রহ ছুটি উইকেট।

মাত্র ৪৮ রান দূরে একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত জয়কে অপেক্ষায় রেখে গাওস্কর এবং গায়কোয়াড় মাঠে নামেন। কিন্তু দর্শকদের নিরাশ করে বিদায় নেন। অবশেষে বেংসরকর এবং মহিন্দর অমরনাথের চণ্ডা কাঁধে ভর রেখেই ভারত জয়ের রাস্তায় ফেরে।

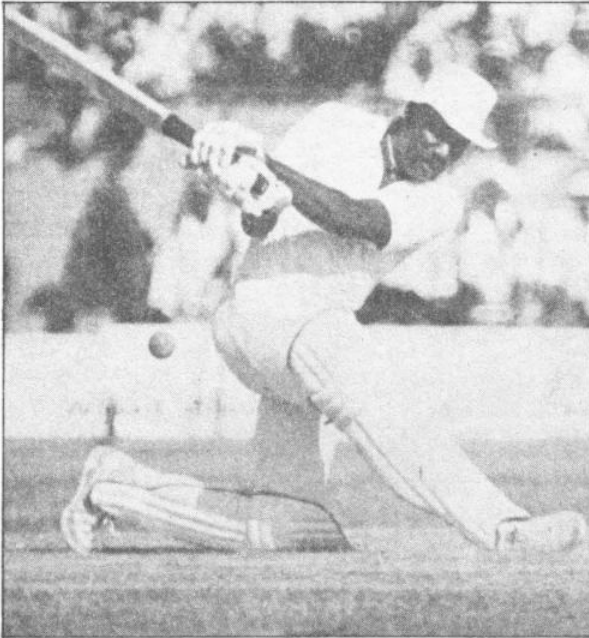
তোপের মুখে অস্ট্রেলিয়া

অশোক রায়

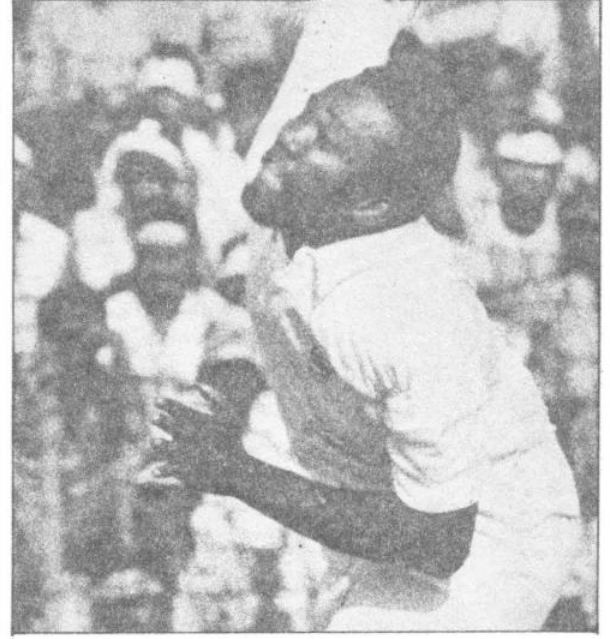
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পার্থে প্রথম টেস্টে দুর্দান্তভাবে জেতার পরেই ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ অবিশ্বাস্যভাবে হেরে গেল নিউ সাউথ ওয়েলসের কাছে। ইদানীং চার পেসারের পাহারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেখানে পৌঁছেছে সেখান থেকে তাকে টেনে নামানোর কথা ভাবা প্রায় পাগলামির শামিল। তবু সেই অসম্ভব কাণ্ডটাই ঘটালেন নিউ সাউথ ওয়েলসের দুই স্পিনার মারে বেনেট এবং বব হল্যাণ্ড। পৃথিবীর নামী-দামী বোলাররা যেখানে বহু চেষ্টায় ব্যর্থ, সেখানে দুই নাম-না-জানাস্পিনারের স্পিন-ভেলকিতে লয়েড, রিচার্ডস, গ্রিনিজ নামের দৈত্যরা দলে থাকা সত্ত্বেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ অহঙ্কারের চূড়ো থেকে ছিটকে পড়বে সে-কথা কেই বা ভেবেছিল। শেষ দিনে ২০৫ রান করলে জিতবে—এই অবস্থায় ব্যাট করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফুরিয়ে গেল মাত্র ১৩৩ রানে। এই ম্যাচের সাফল্য দুই স্পিনারকে সরাসরি অস্ট্রেলিয়ার বারোজনের দলে সুযোগ এনে দেয়।

খৌঁচা খেলে কেউ চূপসে যায়, কেউ ফুঁসে ওঠে। বলা বাহুল্য ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরা দ্বিতীয় দলের। নিউ সাউথ ওয়েলসের কাছে এই বিষ্ময়কর পরাজয়ে উন্মাদ হয়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সুতরাং ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টে তারা যে অস্ট্রেলিয়ানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেই এটা জানা ছিল।

টসে জিতে লয়েড অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে পাঠানো মাত্রই চার পেসার গারনার, মার্শাল, হোল্ডিং, ওয়ালস অস্ট্রেলিয়াকে টুকরো-টুকরো করার কাজ শুরু করে দেন। আঁটোসাঁটো ফিল্ডিং আর ভয়ঙ্কর গতিময় বোলিংয়ের চাপে অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানরা এমনই হাঁসফাঁস করেছেন যে, অবস্থা দেখে মনে হয়েছে ব্রিসবেনের বাতাসে অক্সিজেনের বড়



লয়েড (ব্যাটিংয়ে তোপ দাগছেন)



মার্শাল (বোলিংয়ে তোপ দাগছেন)

অভাব। মাত্র ১৭৫ রানে অস্ট্রেলিয়াকে শেষ করে আত্মতৃষ্টিতে ভুগতে-থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৮৪ রানে পাঁচ উইকেট হারায় অভাবিতভাবে। কিন্তু একশো সাত টেস্টের অভিজ্ঞ লয়েড এবং তরুণ রিচি রিচার্ডসনের যৌথ সেঞ্চুরির সহায়তায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ পৌঁছে যায় রানের পাহাড়ে (৪২৪)। তৃতীয় দিনের শেষেই অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং-যন্ত্র থেকে গোটা-পাঁচেক কলকজা খুলে নেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসাররা। বিপদের মুখে নীরব ও কার্যকর ৬১ রানের ইনিংস খেলেন ওপেনার কেপলার ওয়েসেলস্। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দফায় ২৭১ রানে পৌঁছয় প্রথম টেস্ট খেলতে-নামা ডেভিড বুন (৫১) এবং ওয়েন ফিলিপসের (৫৪) দৃঢ়তায়। মার্শালের পাঁচটি এবং হোল্ডিংয়ের চারটি উইকেট নেবার কৃতিত্ব স্বীকার করে নেবার পরে বলতেই হবে যে, এই ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের ফিল্ডিংও ছিল সর্বোচ্চ মানের। স্লিপে রিচি রিচার্ডসন এবং গালিতে হোল্ডিংয়ের ক্যাচ দুটি তো অলৌকিক।

জয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। তবু মাত্র তেইশ রানের প্রয়োজন মোটাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে দুটি উইকেট হারাল এটাই আশ্চর্যের। কারণ, গত ষোলোটি টেস্টে তারা কখনও দ্বিতীয় ইনিংসে কোনো উইকেট হারায়নি।

এই জয়ের ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ একটানা দশটি টেস্ট জিতল। এবং বুঝিয়ে দিল যে টেস্ট-ক্রিকেটে তাদের জয়ের মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন হয়নি। ০-২ মার্জিনে পিছিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক কিম হিউজ অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন স্বেচ্ছায়। তবে প্রশ্ন হল, নতুন অধিনায়ক যিনিই হোন না কেন খেলার চেহারায় কি তাতে কিছুমাত্র পরিবর্তন হবে?

কলকাতায় আসছেন ফুটবল-আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রেরা

রূপক সাহা

“দূর দূর, ওটা আবার একটা টিম নাকি? সাহস থাকে তো আমাদের সঙ্গে একটা ম্যাচ খেলুক। পুরো এগারোজনকেই কাটিয়ে যদি গোল দিতে না পারি, প্রতিজ্ঞা করছি ফুটবল ছেড়ে দেব।”

ইংল্যাণ্ড টিমকে নস্যাৎ করে দিয়ে এই কথাগুলো একসময় বলেছিলেন আয়ারল্যান্ডের জর্জ বেস্ট। ফুটবল নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে আইরিশদের বরাবরই দারুণ আক্যা-আকচি। তা, সেই সময় আবার ইংল্যাণ্ড বিশ্বকাপ ফুটবলে সদ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বেস্টের হামবড়াই তারা সহ্য করবে কেন? অতএব, ম্যাচের আয়োজন হল।

জর্জ বেস্ট বিরাট মাপের ফুটবলার। ওস্তাদ ড্রিবলার। কিছুটা খামখেয়ালি আর বেপরোয়া না হলে হয়তো কালে-কালে পেলেকেও ছাপিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু একা কী করবেন। চ্যালেঞ্জ ম্যাচে ববি মুর ও তার সতীর্থরা একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লেন বেস্টের দলকে। তবে ইংরেজরা

জর্জ বেস্ট (বল নিয়ে এগোচ্ছেন)

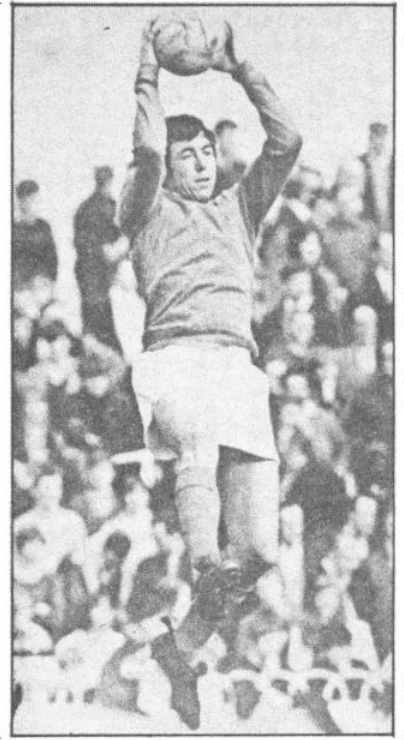


শেষপর্যন্ত দুয়ো দিতে-দিতে মাঠ ছাড়তে পারেননি। কেননা বেস্ট তাঁর কথা রেখেছিলেন। হ্যাঁ, ইংল্যাণ্ড টিমের সেই দুর্ধর্ষ এগারোজনকে (এমনকী গোলকিপার গার্ডন ব্যাক্সকেও পর্যন্ত) কাটিয়ে, ড্রিবলিংয়ের জাদুতে মোহিত করে বেস্ট শেষ পর্যন্ত একটা দারুণ গোল করেছিলেন।

এই অসাধারণ ফুটবলারটি আগে কখনও ভারতে আসেননি। এবারই প্রথম আসছেন—‘সকার নস্টালজিয়া’ ম্যাচ খেলতে। (এই লেখা যখন তৈরি হচ্ছে অন্তত তখনকার খবর এটাই।) কলকাতায় ওই ম্যাচটি হবে আর কয়েকদিন পরেই সেন্ট লেক স্টেডিয়ামে। আর খেলতে আসছেন গার্ডন ব্যাক্স। ছেষটি বিশ্বকাপের সেরা গোলকিপার। ইংল্যাণ্ডের গোলে উনি ছিলেন ব্যাক্সের মতোই নিরাপদ।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি ফুটবল-সাংবাদিকরা ‘ইউরোপের পেল’ বলে যাকে ডাকতেন, পোর্তুগালের সেই ইউসেবিও এই নস্টালজিয়া ম্যাচ খেলতে আসছেন। পূর্ব আফ্রিকায় খুবই গরিব শ্রমিকের ঘরে ইউসেবিও জন্মেছিলেন। সেইজন্যই বোধহয় যখন ম্যাচের সংগঠকরা তাঁকে জানান, উদ্বৃত্ত টাকা সব দাতব্য সংস্থাগুলোকে দেওয়া হবে, তখন ইউসেবিও আর ‘না’ করতে পারেননি সংগঠকদের।

সকার নস্টালজিয়া ম্যাচে খেলবেন আরও একঝাঁক বিশ্বতারকা ফুটবলার। তবে ঐদের মধ্যে সব থেকে বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ দেশের হয়ে খেলেছেন ববি মুর (১০৮)। মুরকে আমরা অবশ্য এ-বছরই দেখেছি নেহেরু কাপ ফুটবলের সময়। এক টিলে এবার দুই পাখি মেরে যেতে আসছেন। বছর দুই আগে মুর হংকংয়ে গিয়েছিলেন প্রশিক্ষণ দিতে। ওখানকার ফুটবল সংস্থা সে সময় তাঁকে অনুরোধ জানান,



গার্ডন ব্যাক্স (লাফিয়ে বল ধরেছেন)

ইতালির জুভেনটাস ক্লাবকে হংকংয়ে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলানোর জন্য রাজি করাতে। মুর বলেছিলেন, চেষ্টা করবেন। লগুনে ফিরে গিয়ে তিনি কথাবার্তাও বলেন জুভেনটাস ক্লাবদের সঙ্গে। যে-কোনো কারণেই হোক, শেষপর্যন্ত প্রদর্শনী ম্যাচ আর হয়ে ওঠেনি। হংকং ফুটবলকর্তারা সেই রাগে মুরের প্রাপ্য টাকা আটকে দিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে মামলা করার জন্যও মুর এদিকে আসছেন।

মুর ও বেস্ট দু’জনে খুব বন্ধু। সত্তর দশকে একবার ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব ফুলহ্যামে একসঙ্গে খেলেওছেন। ওঁরা লগুন থেকে নিয়ে আসছেন আর একজন—আর্ডিলিসকে। এই ফুটবলারটি অবশ্য আর্জেন্টিনার, যদিও এখন খেলছেন ইংল্যাণ্ডের টটেনহাম হসপার ক্লাবে। সকার নস্টালজিয়া ম্যাচে খেলবেন আর্জেন্টিনার মোট সাতজন খেলোয়াড়। বাকিরা হলেন: গোলকিপার ফিলোল, গ্যালোগো, অলগুইন, ট্রোসেরো, কেম্পেস ও লুকে। গত দুটি বিশ্বকাপে ঐদের অনেকেরই নাম তোমরা শুনেছ। ঐদের আর-এক বন্ধু মারাদোনা তো এখন বিশ্বের সব থেকে দামি ফুটবলার। এখন



ইউসেবিও ('ইউরোপের পেল')

খেলেন ইতালির নেপলি ক্লাবে। নেপলস শহরে প্রাসাদোপম বাড়িতে মারাদোনা তাঁর নিজস্ব দলবল নিয়ে থাকেন রাজার হালে। তিনি যখন প্র্যাকটিসে যান, তখন তাঁর গাড়ির সামনে পিছনে পুলিশ-পাহারা থাকে। উনি নিজেও বডিগার্ড নিয়ে ঘোরেন। ব্রাজিলের অস্কার, জাইরজিনহো, কার্লোস আলবার্তো আর বেবেতোর মধ্যে সবথেকে বয়সে ছোট কিন্তু বেবেতো। মাত্র উনিশ বছর। ঐদের সবাইকে তোমরা দেখতে পাবে কলকাতায়। আর ফের আসছেন হাঙ্গারির লাজলো কিস এবং বুনসল। ভিনদেশী এত ফুটবলার আসছেন, ঐরা কিন্তু কথা বলেন কেউ স্প্যানিশ, কেউ ইংরেজিতে। খেলার সময় অবশ্য অসুবিধা হবে না। কারণ ফুটবলের ভাষা সর্বত্রই এক। এই টিমটার কোচ কে হবেন? অবশ্যই ববি মুর।

দোসরা জানুয়ারি খেলার দিন, ফুটবলাররা খেলার আগে পনেরো মিনিট স্কিল দেখাবেন। আসলে সেটাই দেখার এবং শেখার। ফুটবলের এমন অনেক স্কিল আছে, যা আমরা এখনও চোখে দেখিনি। তারকারা খেলবেন কিন্তু আর এক বিশ্বখ্যাত দলের বিরুদ্ধে। ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়ন ক্লাব ফেয়েনুর্ডের বিপক্ষে। সুতরাং হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবেই।

ইডেনে আটবার

নৃপতি চৌধুরী

সিরিজের শুরুতেই ইংল্যান্ডকে হারানোর ফলে ভারতীয় ক্রিকেটে এখন উৎসাহের জোয়ার। এই লেখা তোমরা যখন পড়বে, তখন কলকাতা টেস্ট ম্যাচ ঠিক শুরু হবার মুখে। সাধারণ নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একটা চোখ রেখেও ক্রিকেটপ্রেমীরা যে কলকাতা টেস্টের দিকেও আরেকটি চোখ রাখবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কলকাতা টেস্ট ক্রিকেটেরই শহর।

ইডেনে গাওয়ারের ইংল্যান্ড বনাম গাওস্করের ভারতের লড়াইয়ের ফলাফল কী হবে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটবে আর কটা দিন পরেই। তার আগে চলো ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইডেনের আগের খেলার ফলাফলে একটু চোখ বোলানো যাক।

ইডেনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত প্রথম টেস্ট খেলতে নামে পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৩৪ সালের ৫ জানুয়ারি। কুশলী ক্যাপ্টেন ডগলাস জার্ডিনের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড সেই ম্যাচে ৪০৩ রান করে নিসার, অমর সিং, সি. কে. নাইডুর আক্রমণের বিরুদ্ধে। কলকাতায় সেটাই এখনও ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। ক্লার্ক ও নিকলসের পেস বোলিংয়ের ধাক্কায় ভারত গুটিয়ে যায় মাত্র ২৪৭ রানে। সুতরাং ফলো-অন (এ পর্যন্ত ভারত দশবার ফলো-অন খেয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে)। তবে ফলো-অন খেয়েও সে-যাত্রায় ভারত বেঁচে যায় শ্রেফ সময়ভাবে। দু'দফাতেই দুটি হাফ-সেঞ্চুরি করেন দিলওয়ার হোসেন। অধিনায়ক জার্ডিন ৬১ রান করা ছাড়াও সেই ম্যাচে পাঁচটি ক্যাচ ধরেছিলেন। ইডেনে আর-কোনো ইংরেজের এত ক্যাচ ধরার রেকর্ড নেই।

১৯৫১ সালের ৩০ ডিসেম্বর নাইজেল হাওয়ার্ডের ইংল্যান্ড এসেছিল কম্পটন, হাটন, বোডসার, ইভালকে বাদ দিয়েই। সেটা ছিল সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। ম্যাচটি শেষপর্যন্ত ড্র হলেও কলকাতার দর্শক ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইডেনে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি দেখলেন

দাদু ফাদকারের শাট থেকে (১১৫)। ১৯৬১ সালে ৩ ডিসেম্বর টেড ডেক্সটারের ইংল্যান্ড বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে ভারত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ইডেনের প্রথম জয়টি পায় নরি কন্ট্রাস্টরের নেতৃত্বে। দুরানি এবং বোরদের স্পিন-ছোবলে ক্ষতবিক্ষত হয় ইংরেজরা। তবে ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও মনে থাকবে অধিনায়ক ডেক্সটারের দুটি রাজসিক ইনিংস। ১৯৬৪ সালের ২৯ জানুয়ারি মাইক স্মিথের ইংল্যান্ডের সঙ্গে অমীমাংসিত তৃতীয় টেস্টে মনসুর আলি পতৌদির ভারত সম্মানে সমান-সমান রইল। এই টেস্টে উভয় পক্ষে ইডেনের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলেন যথাক্রমে জয়সীমা (১২৯) এবং কলিন কাউড্রে (১০৭)। ১৯৭২ সালের ৩০ ডিসেম্বর দ্বিতীয় টেস্টে অজিত ওয়াডেকারের নেতৃত্বে উজ্জীবিত ভারত বধ করল টনি লুইসের 'দুর্বলতম' ইংল্যান্ডকে। চন্দ্রশেখরের খুনে মেজাজের সামনে ইংল্যান্ড বাধ্য হল ইডেনে তাদের সবচেয়ে কম রানের নজির গড়তে (১৬৩)। ১৯৭৭ সালের ১ জানুয়ারি দ্বিতীয় টেস্টে টনি গ্রেগের ইংল্যান্ড ইডেনে সর্বপ্রথম জয়টি অর্জন করে বিঘ্নে বেদীর ভারতের বিরুদ্ধে। ব্যাট হাতে অধিনায়ক গ্রেগের সেঞ্চুরির জবাবে বল হাতে অধিনায়ক বেদী পাঁচটি উইকেট নিয়েও ম্যাচের ফলাফল নিজেদের অনুকূলে ঘোরাতে পারেননি। কিথ ফ্রেচারের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গাওস্করের ভারতের সর্বশেষ সাক্ষাৎ ঘটেছিল ১৯৮২ সালের ১ জানুয়ারি। সেটা ছিল সিরিজের চতুর্থ টেস্ট। নিরুত্তেজ ম্যাচে ভারতের কপিলদেব ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইডেনের সর্বোত্তম বোলিং-কীর্তির স্বাক্ষর রাখেন ৯১ রানে ৬ উইকেট নিয়ে।

ইডেনে এবারের টেস্টটি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অষ্টম টেস্ট। কলকাতায় ভারত ২-১ মার্জিনে এগিয়ে আছে। কটা দিনের মধ্যেই জানা যাবে অষ্টমবারের সাক্ষাৎকার ফলাফলে রদবদল ঘটাতে কিনা।

টেস্ট-ক্রিকেটে পিতাপুত্র

অসীমকুমার সরকার

ভারত ও ইংল্যান্ডের চলতি সিরিজের প্রথম ক্রিকেট-টেস্টের (বোম্বাই) প্রথম দিনের খেলায় খুব উল্লেখযোগ্য কিছু না ঘটলেও ইংল্যান্ডের খেলোয়াড় ক্রিশ কাউড্রে পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে টেস্টের আঙিনায় প্রথম অবতীর্ণ হলেন, এবং ক্রিকেটের রেকর্ডবুকে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করলেন। এই নিয়ে পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করে পুত্রের টেস্ট খেলার নজির ঘটল ২৬টি। সেই ১৮৭৭ সালে টেস্ট ক্রিকেটের শুরু। পিতা-পুত্রের টেস্ট খেলার নজির সর্বাধিক রয়েছে ইংল্যান্ডেরই। তাঁরা হলেন জোসেফ ও জো হার্ডস্টাফ, লেন ও রিচার্ড হাটন, ফ্র্যাঙ্ক ও জর্জ ম্যান, জেমস ও জিম পার্কস, সি. এল. ও ডি. সি. টাউনসেণ্ড, ফ্রেড ও মরিস টেট এবং কলিন ও ক্রিশ কাউড্রে।

ভারত ও পাকিস্তানের যৌথ নজির নয়টি। এঁরা হলেন ইফতিখার ও মনসুর আলি খান পতৌদি, দস্তজি ও অংশুমান গায়কোয়াড়, ভিনু ও অশোক মাকড়, লাদা ও তাঁর দুই পুত্র মহিন্দর ও সুরিন্দর অমরনাথ এবং পঙ্কজ ও প্রণব রায় (ভারতের), নজর মহম্মদ ও মুদাস্‌সর নজর এবং হানিফ ও শোয়াইব মহম্মদ (পাকিস্তানের)। ওয়াজির আলি ও জাহাঙ্গির খান ভারতের হয়ে টেস্ট খেলেও তাঁদের পুত্র যথাক্রমে খালিদ



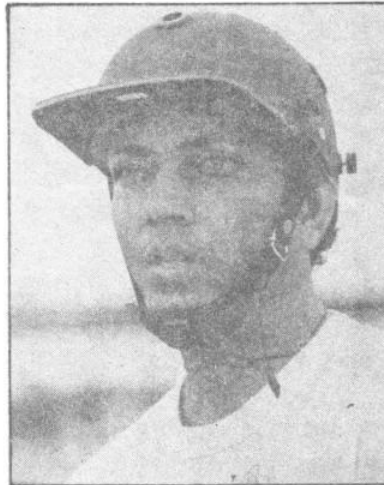
লালা অমরনাথ



কলিন কাউড্রে

ওয়াজির ও মজিদ খাঁ পাকিস্তানের হয়েই খেলেন।

আমাদের অমরনাথ-পরিবারের উল্লেখযোগ্য রেকর্ডটি হল লাদা ও সুরিন্দরের টেস্ট আবির্ভাবই শতরান করার বিরল নজির। লাদা ১৯৩৩ সালে বোম্বাইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১১৮ এবং সুরিন্দর ১৯৭৬ সালে অকল্যাণ্ডে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১২৪ রান করেন। অন্যদিকে নজর মহম্মদ ও মুদাস্‌সর দুজনেই টেস্টের আসরে 'ইনিংস শুরু করতে নেমে শেষ অবধি নট আউট থাকার' বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেন। অমরনাথ-পরিবারের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের হেডলি-পরিবার। এই পরিবারের মধ্যে



মহিন্দর অমরনাথ

রয়েছেন ওয়াল্টার ও তাঁর পুত্রদ্বয় রিচার্ড ও ডেল। এছাড়া এই দেশের আরও দু'টি পরিবার এই কৃতিত্বের অধিকারী—হেনরি ও গ্রাহাম ভিভিয়ান এবং উইলিয়াম ও রবার্ট অ্যান্ডারসন।



ক্রিশ কাউড্রে

টেস্টের আসরে এই বর্ণময় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল ১৮৯০ সালে, যখন জেমস গ্রেগরির পুত্র সিডনি তাঁর টেস্ট-জীবনের প্রথমটি খেলেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে পিতা-পুত্রের টেস্ট খেলার নজির রয়েছে : ফ্র্যাঙ্ক ও জর্জ হার্ন, জন ও ডেনিস লিগুসে, ডেভিড ও ডাডলি নর্স, লেন ও লিগুসে টাকেট—মোট চারটি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের টম ও আলফ্রেড স্কট এবং জর্জ ও রন হেডলিও রয়েছেন এমন নজিরের তালিকায়।

ভারতের পতৌদি ও ইংল্যান্ডের ম্যান পরিবারের পিতা-পুত্র দুজনেরই দেশের নেতৃত্ব দেবার অনন্য নজির রয়েছে। আবার ইফতিখার পতৌদি ও ফ্র্যাঙ্ক হার্ন দুজনেই ইংল্যান্ডেরও প্রতিনিধিত্ব করেন। মজার ব্যাপার হল এই যে, এঁরা দুজনেই ইংল্যান্ডের পক্ষে ও বিপক্ষে টেস্ট খেলার গৌরব অর্জন করেছেন।

পিতা-পুত্র দুজনে মিলে সর্বাধিক ১১৫টি টেস্ট খেলেছেন কাউড্রে পরিবারের কলিন ও ক্রিশ। কলিন খেলেছেন ১১৪টি ও ক্রিশ খেলেন একটি। পিতাপুত্রের টেস্টের আসরে অবতীর্ণ হবার গৌরবময় অধ্যায়ের সর্বশেষ সংযোজন কলিন-তনয় ক্রিশ কাউড্রে এই সংখ্যাটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন ভবিষ্যতে, এমন আশা করা নিশ্চয় অসঙ্গত হবে না।

তুকে এক জ্যোতি জগায়-
রেস্কোনা



জ্যোতির্ময় স্বক.....এক এমন স্বক, যার
স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল - আর,
আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেস্কোনা !

রেস্কোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক
তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ),
লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ - যা, আপনার স্বকের
যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

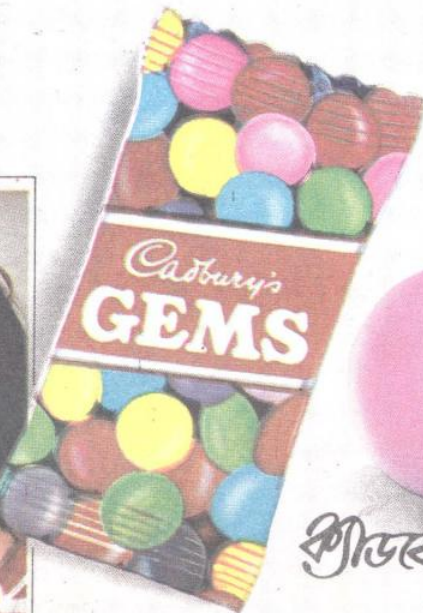
রেস্কোনা আপনার স্বক সাথে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RX 84 2416 BG

বাপি,
তুমি যে জেমস দিয়েছো, ও আমার
দারুন পছন্দ হয়েছে।
তোমার আর আর জন্য
একটি করে দিলাম।
বাপি, আমি তোমাকে
খুব ভালবাসি। পুজা

আজ যখন তুমি জেমস আনবে ঘরে
দেখবে কি মজায় মন উঠবে ভবে
ছোটখাটো দেখতে চকলেটে ঠাসা
খেলতে আর খেতে পারে মজা থাসা



ক্যাডবেরিস্
চকলেটস্